মৃত্যু-বিলাসী

শ্রীজয়ন্ত উপাধ্যায় প্রণীত

প্রিণ্টার ও পাব্লিশার্
শ্রীঅবলাকান্ত রায়।
সিদ্ধেশ্বর প্রেস
৬৯।৩ নং শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৩৩।
মূল্য ৸০ বার আনা।

[All characters in this story are entirely fictitious]

বিচিত্র রহস্য সিরিজ—২য় গ্রন্থ

শ্রীমিহিরকুমার সিংহ সম্পাদিত

সিদ্ধেশ্বর প্রেস ডিপজিটরী
২০।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

বিচিত্র রহস্য সিরিজ—

১। নাগিনী—

২। মৃত্যু-বিলাসী

৩। কালী-সাধক

মৃত্যু-বিলাসী

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের মে মাস। স্থান কলিকাতা, কাল মধ্যাহ্ন।

চিন্তাকুল চিত্তে ইনস্পেক্টর পুণ্যব্রত সেন লালবাজারের পুলিশের আড্ডার সামনে ট্রাম হইতে নামিলেন।

পুণ্যব্রত সেনের মত কর্ম্মকুশল গোয়েন্দা কর্ম্মচারীকে চিন্তিত ও বিষণ্ণ করিতে পারে একমাত্র একটী ব্যাপার—সেটা হইতেছে কোন সমস্যার তদন্তে অকৃতকার্য্য হওয়া। এক্ষেত্রেও, সত্যই তাই ঘটিয়াছিল। ছয়মাস ধরিয়া একটা জটিল রহস্যের তদন্তে দেশবিদেশ ঘুরিয়া, নানা চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়া পুণ্যব্রত সেন আজ গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্ত্তা মিঃ কর্ণফোর্ডের নিকট ব্যর্থতার কথা জানাইতে লালবাজারে আসিয়াছেন।

আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ছয়মাসের দিনরাত্রির ব্যর্থচেষ্টার কথা সবিস্তারে শুনিয়া মিঃ কর্ণফোর্ড বলিলেন, "সেন, তোমার কোন দোষ নাই। তোমার পূর্ব্বে যাঁহারা একাজে হাত দিয়াছিলেন, তাঁহারাও কেহই কিছু বাহির করিতে পারেন নাই।

তবে আর কাহারো হাতে তদন্তের ভার দিয়া দেখি, কোন ফল হয় কিনা।”

সেন একটু সংশয়ের সহিত বলিলেন, “সে-লোকটা যে কে, তাহা কেহই জানে না, কি করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে? তাহার দুষ্কর্মের একটা সঙ্গীও নাই, এমন কি, তাহার পুত্রকন্যাও নাই যে কোন সূত্র ধরিয়া তাহাকে আবিষ্কার করিব।”

ঘটনাটা এই। পোনর বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক ও গদীগুলি এক জালিয়াতের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হইয়া আছে। তাহাকে কেহ দেখে নাই, কেহ তাহাকে জানে না— একমাত্র এইটুকু জানা গিয়াছে, যে তাহার নাম ডি, আর, প্রসাদ। সে নামও যে তাহার সত্য, তাহার কোন প্রমাণ নাই, বরঞ্চ মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ, ১৯২০ সালের মার্চ্চ মাসে যেদিন বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ অষ্ট্রেলেশিয়ান ব্যাঙ্কে জাল চেক দিয়া কে বা কাহারা এক লক্ষ টাকা তুলিয়া লইয়া যায়, সেদিন সকালে এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি ঐ নামে তাজমহল হোটেলে একটী ঘর ভাড়া লইয়াছিল। সেদিন বিকালেই জালিয়াতি ধরা পড়িয়াছিল, এবং সন্ধ্যার মধ্যেই পুলিশ জানিতে পারিল যে, যে-লোকটী সকালে তাজমহল হোটেলে ঘর ভাড়া লইয়াছিল, এ জালিয়াতি তাহারই কাজ। কিন্তু সে-লোকটী তখন নগরের বিরাট জনসমুদ্রে বুদ্বুদের মতই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। মানুষ না মিলিলেও পুলিশ একটা নাম পাইল—ডি, আর, প্রসাদ।

তারপর চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া কিছুদিন অন্তর অন্তর ভারত-

বর্ষের বহু বহু ব্যাঙ্ক ও গদী হইতে জাল চেক ও হুণ্ডী যোগে লক্ষ লক্ষ টাকা উধাও হইয়াছে। পেশোয়ারের আফগান ব্যাঙ্কে উমর খাঁর নাম সহি করিয়া, রেঙ্গুনের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে স্যার অবলোকন্ চেট্টির নামে, কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে রায় বাহাদুর রামরতন সাহার নামে, দিল্লীর কন্টিনেণ্টাল্ ব্যাঙ্কে হরিসিং বাগারিয়ার নামে—আর কত নাম বলিব ?—যে সকল ব্যক্তি জাল চেক ভাঙ্গাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, পুলিশ চেক ও হুণ্ডিগুলি পরীক্ষা করিয়া এটুকু বুঝিয়াছে, যে তাহারা একই ব্যক্তি। কিন্তু আজ চৌদ্দ বৎসরে সেই অদ্ভুত জালিয়াতের কোন সন্ধান মিলিল না। গোয়েন্দার পর গোয়েন্দা ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ছয় মাস পূর্ব্বে জাল সার্টি-ফিকেট দাখিল করিয়া সেই ব্যক্তিই বাঙ্গালা সরকারের ট্রেজারী হইতে পঁচিশ হাজার টাকা বাহির করিয়া লইয়া যায়। প্রবীণ গোয়েন্দা পুণ্যব্রত সেন তদন্তে কিনারা না পাইয়া আজ ফিরিয়া আসিয়াছেন !

কে পারিবে এই চতুরচূড়ামণি চোরকে ধরিতে ? কেহ পারিবে কি ? কর্ণফোর্ড সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া এই কথাই ভাবিতেছিলেন। পুণ্যব্রত সেনের কণ্ঠস্বর কাণে গিয়া তাঁহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল।

সেন বলিতেছিলেন, "কোন একটা ভুল না করিলে তাহাকে ধরে এমন কে আছে ? তবে একজন হয়ত—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি চুপ করিলেন। মিঃ কর্ণফোর্ড

জিজ্ঞাসুভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পুণ্যব্রত একটু থামিয়া বলিলেন—

"হয়তো রবি দত্ত—"

মিঃ কর্ণফোর্ড সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, "হুঁ"। পরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি।"

সেন বিদায় লইলেন।

*　　*　　*　　*

গোয়েন্দা পুলিশের দলে আমাদের আখ্যায়িকার নায়ক রবি দত্তের একটু বিশেষত্ব ছিল। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বয়সে তরুণ। তাহার পিতা রায় বাহাদুর বিনয়কৃষ্ণ দত্ত কোটী-পতি ব্যাঙ্কার। এমন ধনী লোকের ছেলে যে কেন পুলিশে চাকরী করিতে নামিয়াছে, তাহার কাহিনী সামান্য হইলেও অনুধাবনযোগ্য। ইউনিভারসিটিতে পড়িতে পড়িতে একদিন সে ভাইস-চ্যান্সেলারের প্রিয় আরদালীকে বেয়াদবির জন্য প্রহার করে। তারপর ক্ষমাপ্রার্থনা না করাতে ছাত্রদের তালিকা হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হয়।

রায় বাহাদুরের মেজাজ সেদিন একটু রুক্ষ ছিল। ছেলের কীর্ত্তি শুনিয়া তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"লেখা পড়া তো' খুব হো'ল, এখন চরে' খাও গে।" রবি পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিল না, একমাস পরে "রাইটার" কনষ্টেবলের পোষাক পরিয়া বাপের সহিত দেখা করিল এবং সহস্র অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও চাকরী ছাড়িল না।

ঘটনাটা মোটামুটি এই। কিন্তু রায় বাহাদুরকে সেজন্য লজ্জিত বলিয়া মনে হইল না। বরঞ্চ, "ব্যাঙ্কাস ক্লাবে" তিনি একটু সগর্ব্বেই পুত্রের কথা উল্লেখ করিতেন।

প্রভাবশালী লোকের ছেলে বলিয়া রবির যে খুব দ্রুত পদোন্নতি হইয়াছিল, তাহাও নহে। বরঞ্চ, পাছে লোকে কোন রকমের অপবাদ দেয় অথবা কাউন্সিলে কোন অভিযোগ হয়, সে-জন্য পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ণ দুই বৎসর তাহাকে সাধারণ পুলিশম্যানের মত রোঁদে ঘুরাইয়া ছাড়িয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও পাঁচ বৎসরের মধ্যেই সে গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টার হইয়াছিল এবং সেকথা লইয়া কোন অভিযোগই শুনা যায় নাই। পাটের বাজারের ভীষণ জুয়াচুরির আসামীকে ধরিয়া, মান্দালয়ের প্রসিদ্ধ খুনী উ বা চংকে কলিকাতার ছাতাওয়ালার গলিতে স্ত্রীবেশে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার যে-সুনাম হইয়াছিল, তাহাতে তাহার পদবৃদ্ধিতে আপত্তি করিতে কেহ পারিত না। পাটের বাজারের ব্যাপারের পর বাঙ্গালা কাউন্সিলেই তাহার পদোন্নতির কথা অনুমোদিত হইয়াছিল।

রবি দত্তের চার হাত লম্বা ঢ্যাঙ্গা শরীর দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না, তাহার শরীরে কিরূপ অসাধারণ শক্তি। সে বলাই চাটুয্যের গুরুমারা শিষ্য, আবার এদিকে ফুটবলে মোহনবাগানের হইয়া খেলিয়া সে যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করিয়াছিল। সাঁতারে সে আহিরিটোলা ক্লাবে বহু প্রাইজ পাইয়াছিল। একবার কাশীপুরের এক গুদামে জগৎসিং জালানের প্রসিদ্ধ গুণ্ডাদল

তাহাকে বাগে পাইয়া হাত পা বাঁধিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিল। ঐ অবস্থায় সাঁতরাইয়া রবি দত্ত ভোর রাত্রিতে চাঁদপাল ঘাটে পোর্টপুলিশের নৌকায় উঠিয়াছিল এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দলসমেত জগপৎসিংয়ের দলকে গঙ্গায় নৌকা হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছিল। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে, চার্চ্চ লেনের প্রসিদ্ধ তুলা ব্যবসায়ী রামসিং যোধমলের সদর দরজার সামনেই কোম্পানীর ৪৬০০০ টাকা দিন-দুপুরে লুট হয়। সে কাজ জগপৎ সিংয়েরই দলের। রবি দত্ত জগপৎসিংয়ের মাথা জলে ডুবাইয়া রাখিয়া তাহার স্বীকারোক্তি আদায় করিয়াছিল এবং সমস্ত টাকাটার উদ্ধার করিয়াছিল।

এই হইতেছে আমাদের রবি দত্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

* * * *

ইন্‌স্পেক্‌টার পুণ্যব্রত সেনকে বিদায় দিয়া কর্ণফোর্ড সাহেব ভাবিতে বসিলেন। দুই দুইটা মোটা সিগার পোড়াইয়াও তাঁহার মনস্থির হইল না। যখন প্রায় পাঁচটা বাজে, তখন হঠাৎ কি ভাবিয়া তিনি রবি দত্তকে তলব করিলেন। রবিকে চেয়ারে বসাইয়া তিনি ডি, আর প্রসাদের কথা তুলিলেন, রবি বলিল—"স্যার, প্রসাদের কথা আমার সমস্তই মুখস্থ আছে, বেশী বলিবার প্রয়োজন নেই। আমাকে তিন মাসের সময় দিন, তাহার মধ্যেই আমি তাহাকে ধরিয়া আনিব।"

"এতটা ভরসা করা কি ভাল?"

"দেখিতেই পাইবেন, স্যার,"

অতঃপর নানা উপদেশ দিয়া কর্ণফোর্ড সাহেব রবি দত্তকে বিদায় দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে এক দুপুরে দেখা গেল, চশমাপরা একটী শীর্ণ প্রৌঢ় পার্শী ক্লাইব ষ্ট্রীট্ বাহিয়া লাল দীঘির দিকে আসিতেছে। "ব্যাঙ্কো ত্ত ইতালীয়া"র নিকটে আসিয়া লোকটী দাঁড়াইল; দরজায় দরোয়ান দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ীটার নাম কি?"

দরোয়ান গলার স্বর একটু গম্ভীর করিয়া বলিল—"ইয়ে ব্যাকো ত্ত ইতালিয়া হ্যায়।"

শুনিয়া লোকটী যেন সম্ভ্রমে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল। নীচে, একবার এপাশে একবার ওপাশে, চাহিয়া দেখিয়া লোকটী যেন ব্যাঙ্কের বিশালত্ব উপলব্ধি করিতে লাগিল। এমন সময়ে এক-খানি প্রকাণ্ড ঢাকা মোটর গাড়ী আসিয়া ব্যাঙ্কের দরজায় দাঁড়াইল।

গাড়ী হইতে সর্ব্বসমেত তিনটি প্রাণী অবতরণ করিল। প্রথম নামিল একটী সুন্দরী তরুণী, বয়স বছর বাইশেক। তারপর এক প্রৌঢ়া রমণী, পোষাক দেখিলে তাঁহাকে ধনাঢ্যা বলিয়াই মনে হয়। সর্ব্বশেষে নামিলেন একজন ধরাচূড়া পরিহিত সুপুরুষ

যুবক, বয়স তিরিশের উপর, হ্যাট ও ছড়িসমেত। ব্যাঙ্কের নিকটে উঠিয়া তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন।

রমণীর রূপবর্ণনা করা বর্ত্তমান লেখকের সাধ্যাতীত, বিশেষ ঘরে গৃহিণী বর্ত্তমান। তবে দেখা গেল, প্রৌঢ় লোকটী যেন শিকড় গাড়িয়া ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিল।

দরোয়ান্ জিজ্ঞাসা করিল—"আপ্ ক'লকাত্তা-ওয়ালা নেহি হ্যায়, সাব্?"

লোকটী উত্তর করিল—"হামারা মকান্ সিঙ্গাপুরমে। কুক্ কোম্পানীকা গদী কাঁহা হোগা পাঁড়েজী?"

সকলেই জানেন, দরোয়ানদের পাঁড়েজী, পণ্ডিতজী বা তেওয়ারীজী বলিয়া সম্বোধন করিলে তাহাদিগকে এত সুখী করা যায় যে তাহাদের সামনে দিয়া গৃহস্বামীর সর্ব্বস্ব লুট করিয়া লইয়া গেলেও "পাঁড়েজী" দ্বিরুক্তি করে না! যাঁহাদের একথা জানা নাই, তাঁহারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

পাঁড়েজী টমাস কুকের আফিসের সন্ধান বলিয়া দিতে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে কোটপ্যাণ্ট্ পরিহিত একটী যুবক ট্যাক্সি করিয়া ব্যাঙ্কের সামনে আসিয়া নামিল। একবার চারিদিক চাহিয়া, পার্শী ভদ্রলোকটীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া যুবকটী ব্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ব্যাঙ্কের দোতলায় উঠিয়া যুবকটী একেবারে ম্যানেজারের ঘরে

ঢুকিয়া গেল। ক্যাশডেস্কের সাম্‌নে তরুণীকে দেখিয়া সে কেবল একবার ভাল করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইল।

যুবককে দেখিয়া ম্যানেজার অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তার-পর বলিল, "মিঃ দত্ত, এদিকে একবার দেখুন।"

পার্টিশনের দেওয়ালে একটা কাচের ঘুলঘুলি ছিল, তাহার মধ্য দিয়া আফিস ঘরটার সমস্তটাই দেখিতে পাওয়া যাইত। রবি—যুবকটী আর কেহই নয়—আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত ত্রয়ীকে দেখিতে পাইল।

ম্যানেজার বলিল—"প্রৌঢ়াটীকে চেনেন ত? উনি মিস্ পল্লীওয়াল, আজ তিরিশ বছর ধ'রে আমাদের সঙ্গে কারবার। খুব বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক। সঙ্গের সুন্দরী মেয়েটী ওঁর সেক্রেটারী। আর ফুলবাবুটী হচ্ছেন মধুকর গাঙ্গুলী, ওঁর এটর্নী। বয়স অল্প হ'লেও ভদ্রলোকের বেশ নাম আছে।"

রবি দত্ত পুলিশ হইলে কি হয়, যুবক তো! সুন্দরীকে লক্ষ্য করিতে করিতে সে এতটা তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, ম্যানেজারের কথা তাহার কাণেই প্রবেশ করিতেছিল না। তরুণীটীর মুখের মধ্যে কী যে আকর্ষণী শক্তি ছিল বলিতে পারি না; কিন্তু সহসা তরুণীটী মুখ তুলিয়া চাওয়াতে পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হইল, রবির মনে হইল, তাহার মেরুদণ্ড বাহিয়া একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল।

ম্যানেজার কি জানিত, যে এদিকে অনঙ্গদেবের টেলিগ্রাফ চলিতেছে? সে বলিয়া যাইতেছিল—"প্রসাদকে ধরা তো দূরের কথা, খুঁজে পাওয়াও অসম্ভব। তার দল এত চতুর যে—"

প্রসাদের নাম শুনিয়া রবির বাহ্যচেতনা ফিরিয়া আসিল। সে বলিল, "ভগবান করুন, তার একটা দল থাকে। একলা হ'লে ত তার পাত্তাই পাওয়া যাবে না।"

ব্যাঙ্কো ডু ইতালীয়'য় ডি, আর, প্রসাদ দশ দফা জাল চেক ও হুণ্ডি দিয়া প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা হাতাইয়াছে। সেই সব কাগজপত্র রবি পনর মিনিট ধরিয়া দেখিল। তারপর জমার হিসাবের খাতাটা প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরিয়া দেখিল। অতঃপর বাহির হইয়া লালদীঘির দিকে চলিল। সেক্রেটারিয়েটের উত্তরে, যেখানে নিউইয়র্ক ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আছে, সেখানে আসিয়া প্রৌঢ় ভদ্রলোকটীর সহিত তাহার দেখা হইল। প্রৌঢ়টী তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল। এক মিনিট পরে আর একখানি ট্যাক্সিতে রবি তাহার অনুসরণ করিল। প্রথম ট্যাক্সিখানি ঘুরিয়া ফিরিয়া ষ্ট্র্যাণ্ডরোডে ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের দরজায় থামিল।

দুই ঘণ্টা পরে রবি দত্ত লাফাইতে লাফাইতে কর্ণফোর্ড সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া বাংলায়ই বলিয়া ফেলিল—"প্রসাদের ঠিকানা পেয়েছি, স্যার!"

কর্ণফোর্ড সাহেব তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কেহ যদি হঠাৎ আসিয়া বলে, আমি আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ পাইয়াছি, তাহা হইলে সে কথায় কে বিশ্বাস করে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে একদিন সকালে ডি, আর, প্রসাদ বজ্‌বজ রোড দিয়া মোটরে চাপিয়া আসিতেছিল। হাওয়া আফিসের পাশ দিয়া জজ্‌ কোর্ট রোডে পড়িয়া সে চেতলার পুলের কাছে আসিয়া গাড়ীর বেগ কমাইয়া দিল, কারণ সামনে পুলের উপরে একখানি ট্রাম, নীচে আর একখানি, এবং তিনখানি গরুর গাড়ী। পাশে চাহিয়া দেখিল, সেণ্ট্রাল জেলের দুরূহ প্রাচীর, দুর্ভেদ্য লোহার দরজা। দেখিতে দেখিতে দরজা খুলিয়া গিয়া জেলের কালোগাড়ী ভর্ত্তি একদল কয়েদী বাহির হইয়া আসিল। সামনে সঙ্গীন্‌ চড়ানো বন্দুক লইয়া সিপাই, ড্রাইভার ও খোলা রিভলভার হস্তে লালমুখ সার্জ্জেণ্ট্‌। গাড়ী-খানি সরাসর আলিপুরের দিকে চলিয়া গেল।

প্রসাদের মনে একটা যেন আতঙ্ক খেলিয়া গেল। কি ভাবিয়া সে সরাসরি চৌরঙ্গিতে পড়িল এবং ষ্টেট্‌সম্যান কাগজের আফিসের সামনে গাড়ী থামাইল। আফিস তখনো খোলে নাই, একটা দরোয়ান বসিয়া খইনি খাইতেছিল। কর্ম্মখালি স্তম্ভের জন্য একটা বিজ্ঞাপন লিখিয়া প্রসাদ দরোয়ানের হাতে একখানা পাঁচ টাকার নোটশুদ্ধ কাগজটা দিয়া বলিল, এই বিজ্ঞাপনটা কালকার কাগজেই বাহির করিতে হইবে এবং সে পরে আসিয়া উদ্বৃত্ত টাকা লইয়া যাইবে। দরোয়ান সমস্তটাই একটী ভেলা

করিয়া গাঁটস্থ করিল এবং খইনীর আমেজে মহানন্দে রাম-গুণ-গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। আধঘণ্টা পরে যখন কেরাণী বাবুরা আসিয়া পৌছিলেন, তখন সে বিজ্ঞাপনের কথা তাহার মনেই নাই। সাড়ে নয়টার সময়ে ওয়াট্‌সন্ সাহেব আসিয়া তাহার সঙ্গীতমত্ততার জন্য তৎক্ষণাৎ তাহাকে বরখাস্ত করিলেন। বিজ্ঞাপন ও নোটখানি ভূতপূর্ব্ব দরোয়ানের গাঁটেই রহিল।

বিজ্ঞাপন দিয়া প্রসাদের মনের ভার যেন অনেকটা লঘু হইল। সে যদি জানিতে পারিত তাহার বিজ্ঞাপনের দশা কি হইবে তাহা হইলে হয়তো এতটা আনন্দ তাহার হইত না। যাহা হউক, সে মোটর ঘুরাইয়া লইয়া সমবায় বিল্‌ডিংয়ের কাছে একটী হোটেলে গিয়া প্রাতঃরাশ সমাধা করিয়া লইল এবং তারপর গড়ের মাঠে মোহনবাগান ক্লাব ছাড়াইয়া যে বটগাছটী আছে, তাহার পাশ দিয়া খোলা মঠের মধ্যে গাড়ী থামাইল। এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া সে সীটের তলা হইতে একটা সুট্‌কেশ বাহির করিয়া কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ পরিল এবং বেশভূষা বদলাইয়া একেবারে দিল্লীওয়ালা মুসলমান বনিয়া গেল। তারপর প্রসাদ চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে একটা গ্যারেজে গাড়ীখানি সেদিনের মত রাখিয়া ট্রামে চাপিয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীটে নিউ বেঙ্গল ব্যাঙ্কে গিয়া উঠিল। তখন দশটা বাজিয়া সবে পোনর মিনিট হইয়াছে।

প্রসাদ কেরাণীর হাতে একখানি চেক দিতেই কেরাণী সেখানা লইয়া ক্যাশিয়ারের ঘরে প্রবেশ করিল। মিনিট দশেক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হাজী সাহেব, টাকাটা কি এখনই

লইবেন ? দশ হাজারের বেশী টাকা, আমাদের দিতে একটু দেরী হইবে। আপনি ততক্ষণ বসুন।"

"হাজী সাহেব" বসিলেন। ব্যাঙ্কে দুই একজন করিয়া খরিদ্দার জমিতে লাগিল। দুই এক মিনিটের মধ্যেই এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আসিয়া প্রসাদের পাশে বসিল। তারপর দুইজন বাঙ্গালী এবং কাহারো কুর্কীধারী দরোয়ান।

কেরাণী ডাকিল, "হাজী সাহেব, টাকা লইয়া যান।"

প্রসাদ নোটগুলি লইয়া জোব্বার ভিতরের দিকে পকেটে পুরিয়াছে, এমন সময়ে কে পিছন হইতে তাহার কাঁধে হাত দিয়া বলিল—"নমস্কার, প্রসাদ বাবু!"

প্রসাদ চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, এক মুখ হাসি লইয়া রবি দত্ত, যাহাকে সেদিন ব্যাঙ্কো ড ইতালীয়ায় দেখিয়াছিল। মুহূর্ত্তে আত্ম-সম্বরণ করিয়া সে উর্দ্দূ মিশ্রিত হিন্দীতে বলিল—"আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান্ ? আমার নাম হাজী মুবারক এলাহী।"

সেলামের ভঙ্গী করিয়া রবি বলিল—আপনাকেই ত খুঁজছি!

মুহূর্ত্তমধ্যে প্রসাদ লাফাইয়া রবি দত্তের উপর পড়িল।

দেখিতে দেখিতে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়া গেল। বাঙ্গালী খরিদ্দার দু'টী চট্ করিয়া দুইটী রিভলভার বাহির করিয়া যুদ্ধরত দুজনকে ঘিরিয়া ফেলিল। দরোয়ানটী কুরকী খুলিয়া ব্যাঙ্কের বাহিরের দরজা আগলাইয়া রহিল। মাড়োয়ারীটী প্রথমে একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল বোধ হয়, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সেও ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে লাফাইয়া পড়িল।

গড়াইতে গড়াইতে প্রসাদ একবার উপরে উঠিতেই আওয়াজ হইল—"গুড়ুম্"।

দরোয়ানটী মাটীতে পড়িয়া গেল। রক্তে ব্যাঙ্কের মেজে ভাসিতে লাগিল।

কেরাণীটী সহসা পিস্তল বাহির করিয়া তাক্ করিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "প্রসাদ, হাত তোলো, নইলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

প্রসাদ চাহিয়া দেখে, হাত দৃঢ়, লক্ষ্য স্থির। সে বুঝিল, পলায়নের আশা নাই। সদর দরজার দিকে চাহিয়া দেখে, রিভলভার হাতে দুই জন সার্জ্জেণ্ট। সে হাত তুলিয়া দাঁড়াইল।

রবি দত্ত পকেট হইতে হাতকড়া বাহির করিয়া প্রসাদের হাতে পরাইয়া দিল। প্রসাদকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"চেক্‌জাল করার অপরাধে তোমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিলাম। কিন্তু এবার তো তোমার ফাঁসি অনিবার্য্য। পিস্তলটা কা'র?"

প্রসাদ উত্তর করিল না। মাড়োয়ারীটি তখনো মেজেতে বসিয়াছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া রবি বলিল, "আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।"

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পরিচয় করাইয়া দিল—"ইনি আমাদের খদ্দের বাবু রমাপতি সিংজী।"

রমাপতি ধীরে ধীরে উঠিয়া জামা-কাপড় ঝাড়িতে ঝাড়িতে ভাঙা বাংলায় বলিল—"আর একটু হ'লে প্রাণঠো গিয়েছিল আর কি! আমি আর কিছু করতে পারি কি? এ লোকটা কি একদম মরেছে?"

রবি উত্তর দিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল আহত লোকটী প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সার্জ্জেণ্টেরা পুলিশের গাড়ী করিয়া প্রসাদকে হাজতে লইয়া গেল। একখানা এম্বুলেন্স গাড়ী ডাকিয়া মৃত দরোয়ানকে মর্গে পাঠাইয়া দিয়া রবি চিন্তাকুল মনে লালবাজারে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রসাদ তো ধরা পড়িল, কিন্তু—

* * * *

বিচারে প্রসাদের ফাঁসীর হুকুম হইল। ফাঁসীর পূর্ব্বদিন প্রসাদ শেষ অনুরোধ জানাইল, সে একবার রবি দত্তকে দেখিতে চায়। ফাঁসীর দিন প্রত্যূষে রবি হরিণবাড়ী জেলে আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিল।

একটা সিগারেট টানিতে টানিতে প্রসাদ বলিল—"দেখ রবি দত্ত, জীবনে অনেক খুন করেছি, তার মধ্যে কয়েকজন পুলিশ অফিসার আছে। একজন আমাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল, আমার বোট পর্য্যন্ত তাড়া করেছিল। তাকেও নিকেশ করে ছিলাম। তুমি আমাকে ধরে' ফেলেছ। আজ আমার ফাঁসী হ'বে তা'র পর আমার দেহ ছাই হ'য়ে বাতাসে মিশে যাবে। কিন্তু তোমার শোধ আমি নেবই।"

রবি দত্ত হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, নিও।"

প্রসাদ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তুমি ভেবেছ আমি পাগলের মত কথা বল্‌ছি? তা নয়—তুমি দেখে নিও। যারা যারা আমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমি তাদের সকলেরই সর্ব্বনাশ করে

ছাড়ব।" এই বলিয়া সে হাতের আঙুল মটকাইয়া বলিল—
"এই হাত দিয়েই তাদের খুন করব। দেখে নিও।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফাঁসী দেখিবার জন্য রবি অপেক্ষা করিল না। বাহির হইয়া মোটর গাড়ীতে সে বেড়াইবার উদ্দেশ্যে বেহালার রাস্তা বাহিয়া দক্ষিণে চলিল। একটু পরেই পথে শুনিতে পাইল, বর্দ্ধমানের মহারাজার বাড়ীতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল। আটটায় প্রাসাদের ফাঁসি হইবার কথা। প্রসাদ জালিয়াত খুনী হইলেও রবির মনে একটা দুঃখের ভাব আসিল। ভালই হোক্, আর মন্দই হোক্, একটা মানুষের জীবন অমূল্য। হয়তো প্রসাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আছে, তাহারা আজ কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছে। কেন মানুষ এত পাপ করে?

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে রবি বেহালা ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে পড়িয়াছে। চারিদিকের পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে অখণ্ড শান্তি। রাস্তার দুই ধারে মাঝে মাঝে ঝোপজঙ্গল, দূরে মাঠের মধ্যে এক-আধজন কৃষক দেখা যাইতেছে। খানিকদূর গিয়া রবি গাড়ী ঘুরাইয়া লইল।

গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে রবি ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইয়া ফিরিতেছে। একটা মোড়ের কাছে অন্যমনস্কভাবে আসিতেই কি একটা জিনিষ সজোরে তাহার গাড়ীর সামনের কাঁচে আঘাত করায় কাঁচখানি ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া পড়িল। অবিলম্বে ব্রেক কসিয়া সে গাড়ী থামাইল। অমনি—

আবার "গুড়ুম্"

গাড়ীর হুড্ ছিদ্র করিয়া আর একটা গুলি চলিয়া গেল। রবি মুহূর্ত্তের মধ্যে নামিয়া পড়িল। যে-দিক হইতে গুলি আসিয়াছে আন্দাজ করিয়া সে রিভলভার হাতে সেদিকে ছুটিল। খানিক দূরে রাস্তার ধারে একটা জঙ্গলপূর্ণ বাগান, সেখানে যেন ধোঁয়ার মত কি একটা দেখা যাইতেছে। আঁকিয়া বাঁকিয়া দৌড়িয়া সে সেই বাগানে ঢুকিল। আরও একটা গুলির শব্দ সে শুনিতে পাইল।

রবির সেদিকে লক্ষ্যই নাই। একটা নারিকেল গাছের তলায় অনেকগুলি উলুখড়ের ঝোপ জন্মিয়াছিল, তাহারই মধ্যে সে লক্ষ্য করিল কে একটা লোক পড়িয়া আছে। কাছে গিয়া দেখিল, শ্যামবাজারের গুণ্ডার সর্দ্দার গুণধর গয়লা। একেবারে মৃত, পাশে একটা দোনলা বন্দুক।

রবি ভাবিল, একি সত্য, না স্বপ্ন? গুণধর এখানে কেন? এই তো সেদিন সে তিন বৎসর জেল খাটিয়া আসিয়াছে! দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, নিকট হইতেই কে তাহাকে পিস্তলের গুলিতে নিহত করিয়াছে। বন্দুকের নলা দুইটি তখনও গরম

রহিয়াছে, নলা দুইটির মধ্যে খালি কার্তুজ পোরা। রবি বুঝিতে পারিল, কোথা হইতে তাহার উপরে গুলি করা হইয়াছিল।

এমন সময়ে ফট্-ফট্ শব্দ শুনিয়া সে চাহিয়া দেখে, বড় রাস্তা দিয়া একখানি মোটর সাইকেল ভীমবেগে কলিকাতার দিকে চলিয়া গেল। রবি পুলিশ ডাকিবার জন্য রাস্তায় গাড়ীর দিকে চলিল।

বড় রাস্তা হইতে প্রায় দেড় রশি তফাতে আছে, এমন সময়ে সে দেখিতে পাইল, একখানি ছাত-ঢাকা মোটর গাড়ী হুস্ করিয়া ঐ দিকেই চলিয়া গেল। রবির চীৎকারে গাড়ীর চালক কর্ণপাতও করিল না।

একটু পরেই সে একটা আওয়াজ শুনিতে পাইল—'গুড়ুম্', 'গুড়ুম্', যেন বোমা ফাটিতেছে। দৌড়িয়া বড় রাস্তায় পড়িতেই সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিতে পাইল।

তাহার গাড়ীখানি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

রবি দত্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অজ্ঞাত মটর সাইকেল-আরোহী এবং মটরগাড়ীর চালকের যে, সকালের এই দুই ভয়াবহ ব্যাপারের সহিত কি সম্পর্ক তাহা সে অনুমান করিয়া লইতে পারিল। গুণধর ডাকাতি করিয়া ফেরার হইয়াছিল, তাহাকে খুলনা জেলায় সুন্দরবনে গিয়া রবিই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসে। গুণধরের তাই তাহার উপর আক্রোশ ছিল, সেই আক্রোশের বশেই হয়ত সে রবিকে গুলী করিয়া প্রতিশোধ লইতে প্রলুব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কে প্রলুব্ধ করিয়াছিল? রবির ধারণা

হইল, এ প্রসাদের দলের লোকের কাজ। দুই গাড়ীর আরোহীই যে এই ব্যাপারে জড়িত, তাহাতে তাহার মনে কোন সন্দেহ রহিল না। একজন ব্যর্থকাম গুণধরকে হত্যা করিয়াছে, অপর জন বোমা ছুঁড়িয়া তাহার গাড়ী বিধ্বস্ত করিয়া পশ্চাদ্ধাবনের উপায় বন্ধ করিয়াছে।

প্রায় তিন মাইল হাঁটিয়া রবি বেহালায় আসিয়া বাস্ ধরিল। তারপর বাড়ীতে স্নানাহার শেষ করিয়া বৈকালে কর্ণফোর্ড সাহেবের নিকটে হাজির হইল। সকল ঘটনা শুনিয়া কর্ণফোর্ড সাহেবের মুখ গম্ভীর হইল।

"যদি সত্যসত্যই এই ঘটনা না ঘটিয়া থাকিত, তাহা হইলে আমি বলিতাম, ইহা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য।" এই কথা বলিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রসাদ তো মরিয়াছে। তুমি কি মোটরগাড়ী ও মোটর সাইকেলের কোন সন্ধান পাইয়াছ?"

রবি জবাব দিল, "মোটরের সন্ধান পাই নাই, হয়তো অন্য পথ ঘুরিয়া কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। মোটর সাইকেলের সন্ধান অনেকদূর পাইয়াছি, কিন্তু আপাততঃ তাহা কয়েকদিনের মত গোপন রাখিতে চাই। সাহেব, আমাদের সামনে একটা ভয়ঙ্কর প্রহেলিকা!"

সাহেবের কপালে চিন্তার রেখা দেখা গেল। তিনি বলিলেন, "কিন্তু প্রসাদ তো কখনো দল বাঁধিয়া কাজ করিত না। কাজেই এ যে তাহার লোকের কাজ, তাহা বুঝিব কেমন করিয়া?"

"সে কথা সত্য। কিন্তু স্যার, আমার নিজের ধারণা,

অনেকগুলি খুন-খারাপি এখন হইবে। কাহারা যে এ সব করিতেছে, তাহা আমি জানি না। তাহারাই কিন্তু আমাকে খুন করিবার জন্য গুণধরকে নিযুক্ত করিয়াছিল, এবং গুণধর অপারগ হওয়ায় তাহাকে হত্যা করিয়াছে।"

* * * *

বস্তুতঃ রবির কথাই সত্য হইল। ইহার পর একবৎসরের মধ্যে অনেকগুলি লোকের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল। কেহ মরিল বাস্ সংঘর্ষে, কেহ মরিল অজ্ঞাত রোগে, কেহ বা বিষপানে আত্মহত্যা করিল, কেহ মরিল গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া। বিস্ময়ের কথা এই যে, তাহারা সকলেই প্রসাদের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ডের সহিত কোন না কোন রকমে সংশ্লিষ্ট। জনসাধারণের মনে কোন সন্দেহ রহিল না, এমন কি 'ভ্যান্‌গার্ড' কাগজের দুর্দ্ধর্ষ রিপোর্টার কেষ্ট চাটুজ্যে, দৈনিক 'মহানন্দ' কাগজের সুবোধ বাঁড়ুজ্যে—যাহারা পুলিশের ভিতরের খবর রাখে—তাহারাও কিছু সন্দেহের কারণ খুঁজিয়া পাইল না। কেবলমাত্র লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে ফাইলের পর ফাইল জমিতে লাগিল, ডিটেক্‌টিভেরা দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং রবি দত্তের স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মিস্ পল্লীওয়ালের বয়স ষাটের কাছাকাছি হইলেও দেখিয়া বয়স ধরা যায় না। লম্বা সুগঠিত শরীর, চোখ দুটী একটু ছোট হইলেও উজ্জ্বল, মুখচোখে একটা বিশেষ বুদ্ধিমত্তার ছাপ। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের তুলনায় বিষয়বুদ্ধি যে একটুও কম নয়, তাহা আর যেই জানুক বা না-জানুক, তাঁহার সেক্রেটারী ললিতা সেনের তাহা ভাল করিয়াই জানা ছিল।

মিস্ পল্লীওয়াল ল্যান্সডাউন রোডে একটা বাগানওয়ালা বাড়ীতে বাস করিতেন। সাজে, সজ্জায় এবং বহির্দৃশ্যে বাড়ীটা তাঁহার মত মহিলারই যোগ্য।

দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে একদিন মিস্ পল্লীওয়াল ললিতা সেনকে ডাকিয়া বলিলেন (মিস্ পল্লীওয়াল অবাঙ্গালী হইলেও ভাল বাঙ্গালা বলিতে পারিতেন)—"দেখ, একবার খড়দায় এশিয়াটিক্ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অনন্ত মল্লিকের বাড়ীতে গিয়ে এই পার্শেলটা দিয়ে আসতে পারবে?" এই বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী টেবিলের উপরে রাখা একটী কাঠের ছোট বাক্স দেখাইলেন।

ললিতা সেন ব্রাহ্ম মেয়ে, বাংলাদেশের বাহিরে মানুষ। তার উপরে চাকরী করিয়া খায়। অনাবশ্যক লজ্জা করিয়া চলিলে তাহার চলিবে কি করিয়া? অনন্ত মল্লিক বৃদ্ধ লোক

চরিত্রের কোন দোষই নাই। শত্রুতেও চরিত্রে কলঙ্ক দেয় না। এমন লোকের বাড়ীতে যাইতে ললিতার আপত্তি কি?

"অনন্ত বাবু হয়তো তোমাকে চা খেতে নেমন্তন্ন করবেন। রাত্রে মধুকর বাবু এখানে খাবেন, তুমি না থাকলে তাঁর মন খারাপ হ'তে পারে।" এই বলিয়া মিস্ পল্লীওয়াল একটু হাসিলেন। ললিতাও হাসিল। যে কারণেই হউক, এর্টণী বাড়ীতে আসিলেই বৃদ্ধা তাহার কারণস্বরূপ ললিতার কথা উল্লেখ করিতেন। ব্যাপারটা একটা রসিকতার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বৃদ্ধার সাংসারিক আচার ব্যবহার ছিল সাহেবী ধরণের; ললিতাও সাহেবী আচারে শিশুকাল হইতেই অভ্যস্ত ছিল, তাহারও অসুবিধা হয় নাই।

কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহির হইবার সময়ে মিস্ পল্লীওয়াল ললিতাকে বলিলেন, "ললিতা, অনন্ত বাবুকে বোলো যে মধুপুরেই তো আগামী সপ্তাহে দেখা হ'বে। কাজেই চিঠি লিখে আর ধন্যবাদ জানানোর দরকার নেই।"

ট্যাক্সি করিয়া ললিতা শিয়ালদহে আসিল। ইণ্টারক্লাসের একখানা রিটার্ণ টিকিট কাটিয়া সে রাণাঘাটের গাড়ীতে চাপিয়া বসিল। খড়দা ষ্টেশনে নামিয়া ঠিকাগাড়ীর এক গাড়োয়ানকে অনন্ত মল্লিকের বাড়ীর কথা বলিতেই সে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে বলিল।

গাড়ীখানি ফিটন্‌গাড়ী। ষ্টেশনের রাস্তা পার হইয়া গাড়ী যখন গঙ্গার ধার দিয়া চলিয়াছে, তখন গাড়োয়ান একখানা মটর-

বোট দেখাইয়া বলিল,—"এই বোটখানা দেখ্‌ছেন মা-ঠাক্‌রুণ ? এ হচ্ছে প্রসাদের বোট। প্রসাদ নাকি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জালিয়াত। পুলিস খুন করেছিল বলে তার ফাঁসী হয়।"

নামটা ললিতার জানা-জানা মনে হইতে লাগিল। আর একটা বাড়ীর গেট পার হইয়া গাড়োয়ান বলিল—"এই বাড়ীর পরেই, মা, অনন্তবাবুর বাড়ী। কিন্তু প্রসাদের বাড়ী আর অনন্ত বাবুর বাড়ী প্রায় লাগোয়া—এটা খুব মজার ব্যাপার।"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ?"

"অনন্তবাবুইত প্রসাদকে ধরিয়ে দেন। অনন্তবাবু আর রবি দত্ত গোয়েন্দা। আরও মজার কথা মা, রবি দত্ত বাবু আজ সকালেই অনন্তবাবুর বাড়ী এসেছেন। আমার গাড়ীতে করেই গিয়েছিলেন।"

অনন্ত মল্লিক এশিয়াটিক ব্যাঙ্কের কেরাণীর পদ হইতে ক্রমে ক্রমে ম্যানেজারের পদলাভ করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কার্স এসোশিয়েসনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা। মিস্ পল্লীওয়াল শতমুখে তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন। তাঁহার সহিত ব্যাঙ্কে গিয়া ললিতা কতবার অনন্তবাবুকে দেখিয়াছে। শুভ্রকেশ, গোঁফদাড়ি-কামান প্রশান্ত মুখ লোকটীকে দেখিলেই মন খুসী হয়, এক মুহূর্ত্তেই বিশ্বাস হয়, লোকটীর মনে কোন ময়লা নাই। অনন্তবাবু অবিবাহিত ; সোমবার হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকেন, কিন্তু ছুটী পাইলেই বা সপ্তাহশেষে খড়দার পল্লীশ্রীর মধ্যে বাসকরা তাঁহার চাই।

অনন্ত মল্লিকের বাড়ীর সামনে গাড়ী থামিল। অজস্র ফুলে সমাকীর্ণ বাগান, তারমধ্যে একটু টেনিস্ খেলিবার মাঠ, তারপরে একতলা নাতিবৃহৎ বাংলো প্যাটার্ণের লাল রংয়ের বাড়ী। বাড়ীর পাশে আর একটা সযত্নবিন্যস্ত মাঠ, তার পাশেই কলনাদিনী গঙ্গা। বাড়ীখানি যেন স্তব্ধ শান্ত।

হাতব্যাগ হইতে একটা আধুলি বাহির করিয়া ললিতা গাড়োয়ানকে দিতে গেলে গাড়োয়ান বলিল, "ভাড়া দিতে হবেনা মা। অনন্তবাবুর সাথে আমার মাসোহারা বন্দোবস্ত আছে।"

গাড়োয়ান গাড়ী ঘুরাইল। একজন খানসামা আসিয়া ফটক খুলিয়া অভিবাদন করিয়া ললিতার হাত হইতে পার্শেলটী লইল। তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে বাড়ীতে আসিয়া ললিতা বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসিল। সে ভাবিতে লাগিল, এই সৌম্য মূর্ত্তি বৃদ্ধ কেমন করিয়া প্রসাদকে ধরাইয়া দিল?

এক মিনিটের মধ্যেই অনন্ত মল্লিকের আবির্ভাব। ললিতাকে নমস্কার করিয়া বৃদ্ধ পাশে একখানা চেয়ারে বসিয়া পার্শেলটী খুলিয়া ফেলিলেন। বাক্সের মধ্য হইতে একটী সুন্দর মহাকাল মূর্ত্তি বাহির হইল। অনন্ত সোৎসাহে বলিলেন,—"চমৎকার, চমৎকার! মিস্ পল্লীওয়ালের কি সৌজন্য! ভারী সুন্দর, ভারী সুন্দর!" মূর্ত্তিটার ভাস্কর্য্য বেশ নিপুণ, কিন্তু মুখের ভাব অত্যন্ত করাল ও ক্রুর।

মল্লিকের সাদর আহ্বানে ললিতা ড্রয়িংরুম পার হইয়া পিছনের লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিল। লাইব্রেরী ঘরের পশ্চিমের জানালা

দিয়া অপরাহ্নের অপরূপ সৌন্দর্য্যময়ী গঙ্গা দেখা যাইতেছিল। ঘরে সু-সজ্জিত বই ও প্রাচীন মূর্ত্তির সংগ্রহ। সর্ব্বত্র যত্নের চিহ্ন।

ঘরে আর একজন লোক বসিয়া ছিল, সে জানালার দিকে মুখ করিয়া বোধ হয় গঙ্গার শোভাই দেখিতেছিল। ললিতার মনে হইল, ইহাকে সে কোথায় দেখিয়াছে। সহসা তাহার মনে হইল, এই লোকটীকেই সেদিন ব্যাঙ্কে দেখিয়াছিল।

অনন্তবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন—"মিস্ সেন, ইনি মিঃ রবি দত্ত।"

রবি দত্ত! কে রবি দত্ত! পলকে তাহার মনে হইল, প্রসাদ···মটর বোট · ফাঁসী···অনন্ত মল্লিক···রবি দত্ত! দুজনে দুজনের দিকে সোৎসুকে চাহিলেন।

ঘড়িতে চারিটা বাজিল। অনন্তবাবু বলিলেন, "এবারে একটু চা খাওয়া যাক্। কী বলেন?" কেহই আপত্তি করিল না, অনন্তবাবু বেল্ বাজাইয়া ভৃত্যকে চা আনিবার আদেশ দিলেন। রবি দত্ত আবার গঙ্গার শোভা দেখিতে লাগিল। গঙ্গার শোভা দেখিতেছিল, না জেলেরা কি উপায়ে ইলিশ মাছ ধরে, তাহাই দেখিতেছিল, কে জানে?

অনন্তবাবু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মূর্ত্তিটী দেখিতেছিলেন। তাঁহার উল্লাসসূচক উক্তি শুনিয়া রবি ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কেমন দেখি?" বলিয়া সে মূর্ত্তিটা লইয়া জানালার কাছে গিয়া দেখিতে লাগিল। একটু পরেই সে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, পায়ের নীচে দেখি কি লেখা আছে! বোধ হয় প্রাকৃতে লেখা।"

রবি ও অনন্ত পাশাপাশি দাঁড়াইয়া পাঠোদ্ধার করিতে লাগিলেন। যাহা লেখা ছিল, তাহার মর্ম্মার্থ এই :—

"আমি মহাকাল, সব পথের শেষে আমি।
মানুষ আমাকে দেখিয়া সুখশান্তি ভুলিয়া যায়,
আপনার মৃত্যুবরণ করে।
হে জীব আমাকে বেশী ভালবাসিও না,
মৃত্যু তোমার আপনার হাতের মধ্যেই।"

অনন্তবাবু সোৎসাহে বলিলেন, "চমৎকার! সুন্দর! এ মূর্ত্তির মত আর মাত্র একটা মূর্ত্তি আছে, সেটা লাহোর মিউজিয়মে। মিস্ সেন, আপনার মনিবকে আমার অজস্র ধন্যবাদ জানাবেন।"

"মহাকাল?" বলিয়া রবি ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন।

ললিতা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। পুলিশের গোয়েন্দা, গুণ্ডা-বদমাইস্ ধরাই যাহার কাজ, সেও প্রাকৃত ভাষায় পাঠোদ্ধার করিতে পারে? রবির মুখের দিকে তাকাইতেই ললিতা দেখে, রবি তাহার দিকে জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া আছে। কিছু না ভাবিয়াই সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"মিঃ দত্ত, ডি, আর, প্রসাদ কে?"

প্রথমতঃ কেহই উত্তর দিল না। অনন্তবাবুর মুখভাবে অস্বস্তির চিহ্ন দেখা গেল। ললিতা ভাবিল, জিজ্ঞাসা করাটা বোধহয় অসভ্যতা হইয়াছে। সে বলিল—"না বুঝে অপরাধ ক'রে ফেলেছি, মাপ কর্ব্বেন।"

রবির কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। বরঞ্চ একটু হাসিয়াই সে বলিল,—"ডি, আর, প্রসাদ ছিল একজন জালিয়াত,

সে একজন পুলিশকে খুন করেছিল। আমি তাকে গ্রেপ্তার করেছিলাম, সে তখন গুলী ক'রে একজন পুলিশকে মারে। তার ফাঁসি হয়েছিল। তার কাছে যে পিস্তল থাকবে তা আমরা আশা করি নি। জালিয়াতি করে' সে ভারতবর্ষের সব ব্যাঙ্ক থেকে বহু লক্ষ টাকা বের করেছিল। আমি আর অনন্তবাবু তার জন্য একটা ফাঁদ পেতেছিলাম। সে সেই ফাঁদে পড়েছিল। যদি তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী হয়, সে আমিই। অনন্তবাবু কিন্তু সেজন্য একটু বিব্রত হচ্ছেন, কারণ তাঁর ধারণা—"

অনন্তবাবু ব্যাগ্রভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, "সে সব কথা যাক্, রবি বাবু··আঃ, এই যে চা এসেছে।"

চা পান করিতে করিতে ললিতা ভাবিতে লাগিল, অনন্ত মল্লিকের এ বিষয়ে এত ভাবনা কিসের? রবিই বা কেন অনন্ত মল্লিকের দায়িত্ব স্খালন করিতে চায়? ললিতা লক্ষ্য করিল, অনন্তবাবু যেন জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিতেছেন।

চা খাওয়া শেষ হইলে ললিতা উঠিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গেল। ফিরিবার ট্রেণের তখনো প্রায় আড়াই ঘণ্টা দেরী। গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে এমন সময়ে পিছনে কাহার ডাক শুনিয়া সে ফিরিয়া দেখে, রবি দত্ত। তাহার মুখে ললিতা শুনিল, অনন্তবাবু বিশ্রাম করিবার জন্য শয়ন ঘরে গিয়াছেন।

ললিতা অনুতপ্তস্বরে বলিল—"দোষ আমারই। আমি যে কেন বোকার মত কথাটা তুলেছিলাম জানি না। অথচ এ সব খুনজখমের ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহই নেই।"

"আমার অন্য কিছুতেই উৎসাহ নেই।" এই বলিয়া রবি দত্ত বলিল—"মনের অস্বস্তি আর কি। আমারও আজকাল অমনি হয়

ললিতা বলিল, "আপনাকে দেখে একেবারেই গোয়েন্দা ব'লে মনে হয় না কিন্তু।"

রবি বলিল, "আমার নিজেকে গোয়েন্দা বলে' মনেই হচ্ছে না। এক বছর আগে আমি ভাবতুম, আমিই সব চেয়ে ভাল গোয়েন্দা। আজ মনে হচ্ছে কেবল ভাগ্যের জোরেই বদ্‌মায়েস ধরেছি।"

আশ্চর্য্য হইয়া ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"কারণ, আগামী সপ্তাহেই তারা অনন্তবাবুকে খুন করবে, তা ঠেকাবার আমি কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ললিতা স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাহার কাণকেও বিশ্বাস করিতে পারিল না। রবিকে প্রশ্ন করিল—"আপনি সত্যি বল্‌ছেন, না ঠাট্টা করছেন?"

"সত্যি বলছি। আপনাকে দেখেই আমি বুঝেছি আপনাকে

বিশ্বাস করা যায়। তাই আপনার কাছে বল্‌ছি। যাহোক্‌, সে কথা যাক্‌। আসুন, নৌকায় করে' এখন একটু গঙ্গায় বেড়াবেন।"

ঘাটে একখানা বিলাতী ধরণে তৈরারী ছোট মোটর বোট্‌ ছিল। দুজনে তাহার মধ্যে গিয়া পাশাপাশি বসিল। বোট্‌ ছাড়িয়া দিল। অপরাহ্ণের হীরকখচিত গঙ্গায় নীরবে পাশাপাশি বসিয়া দুইজনেই মনে মনে বুঝিতে পারিল, পরস্পরের জীবনধারা অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। কে যেন বার বার খোঁচা দিয়া জানাইয়া দিতে লাগিল, তাহাদের জীবনে একটা বিশেষ কিছু অনতিবিলম্বেই ঘটিবে।

মাঝ গঙ্গায় উত্তরদিকে খানিকদূর গিয়া রবি কূল বাহিয়া বোটের মুখ ফিরাইল। প্রসাদের নৌকা যেখানে ছিল তাহার নিকটে গেলে সে দেখিল, ললিতা একদৃষ্টে ঐদিকে তাকাইয়া রহিল। রবি বলিল, "আপনার বোটখানা দেখতে বড্ড কৌতূহল হচ্ছে, মিস্‌ সেন? আচ্ছা চলুন, ভাল করে দেখে আসি। দুই একটা মজার জিনিষও দেখতে পাবেন।"

প্রসাদের বোট্‌খানা যে কত অযত্নরক্ষিত, নিকটে আসিলেই তাহা বোঝা যায়। বোটে উঠিয়া রবি দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল। ভিতরে একেবারে অন্ধকার, রবি দেশলাই জ্বালিয়া একটা ছোট ছাপাখানা দেখাইয়া বলিল, "এখানে প্রসাদের ছাপাখানা ছিল, তাতে নোট্‌ জাল হ'ত। বোটের ব্যাটারিতে ছাপাখানা চল্‌ত।"

পকেট হইতে একটা টর্চ্চ বাহির করিয়া রবি বলিল, "এইবার একটা মজা দেখুন।"

ললিতা টর্চ্চের আলোয় দেখিল, ক্যাবিনের ভিতরের দেওয়ালে কাঠ খুদিয়া লেখা আছে :—

১৭ই এপ্রিল, ১৮৬৫। র, প, দ, সিঙ্গাপুর।

২রা আগষ্ট, ১৮৭০।

৮ই জানুয়ারী, ১৮৯৫।

১৪ই অক্টোবর, ১৮৯৯।

১৩ই জুন. ১৯০১।

২৯শে নভেম্বর, ১৯০৭।

১২ই মে, ১৯৩৪।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৫।

রবি একটু শ্লেষের স্বরে বলিল, "কেমন আশ্চর্য্য সব ভবিষ্যদ্বাণী দেখেছেন তো ? বরাহমিহির হার মানে।"

ললিতা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "এর অর্থ কি ? এ সব কে লিখেছিল ?"

"জানতে পারলে তো ভালই হোত।" এই বলিয়া রবি পুনশ্চ কহিল, 'তবে ১৯৩৪ সালের তারিখটা কি বলতে পারি। ঐ দিন শ্রীযুক্ত প্রসাদের ফাঁসী হয়েছিল।"

ললিতার শিরদাঁড়া বাহিয়া যেন বরফের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বোটের অন্ধকারের পিছনে একটা বীভৎস কঙ্কাল কোটরগত চক্ষু দিয়া

জলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। সে কেবিনের বাহিরে চলিয়া আসিল। একটু পরে রবিও বাহির হইয়া আসিল

নিজেদের বোটে নামিয়া রবি বলিল "গতবৎসর তদন্তের সময়েই লেখাটা দেখেছিলাম।"

ললিতা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "কিন্তু নিজের মৃত্যুর তারিখ কি সে নিজেই লিখে রেখেছিল?"

রবি বলিল, "না—মৃত্যু-বিলাসীর দলই সেটা করেছিল।"

ললিতার সংশয় ক্রমেই বাড়িতেছিল। সে ভাবিতেছিল, রবি দত্ত হয়ত ঠাট্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ললিতা দেখিল, রবি একদৃষ্টিতে প্রসাদের বাড়ীর বন্ধ দরজাটার দিকে তাকাইয়া আছে, ডানহাতখানা পকেটের মধ্যে। দিনের আলোতেও ললিতার স্পষ্ট বোধ হইতেছিল একজোড়া অদৃশ্য চক্ষু তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।

তাহার মনোভাব উপলব্ধি করিয়া রবি বলিল, "কাল রাত্রে কে বোটে এসেছিল। চৌকাঠে একটা সরু সুতো জড়িয়ে রেখেছিলাম, সেটা আজ দেখি ছিঁড়ে গেছে।"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল—"প্রসাদের কি স্ত্রী-পুত্র কেউ ছিল?"

রবি বলিল—"যতদূর জানি, ছিল না।"

গাঢ়স্বরে ললিতা প্রশ্ন করিল, "৪ঠা অক্টোবর কি হ'বে?"

"সেই তো প্রশ্ন!" বলিয়া রবি বলিল,—"এই মৃত্যু বিলাসীদের কেউ চেনে না, জানে না। আমি নিজে যেটুকু জানি তাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। প্রসাদ অনেক টাকা জালিয়াতি করে

করেছিল। কিন্তু সে টাকা যে কোথায় গেল, তা কেউ জানে না।—তার পেছনে ছিল এই মৃত্যু-বিলাসীরা। শুনুন। গত বৎসর পূজার সময়ে অনন্ত বাবুর খুড়তোত ভাই অসিত মল্লিক ওয়ালটেয়ারে গিয়েছিলেন। তিনি সমুদ্রে ডুবে মারা যান্। অনন্ত বাবুর ধারণা, এটা আকস্মিক অপমৃত্যু। আমার ধারণা কিন্তু তারা ভুলে মল্লিককে ডুবিয়েছিল।"

"খুন?"

রবি মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

প্রসাদ অনন্ত মল্লিকের বাড়ীর মধ্যে একখানি সুন্দর বাগানওয়ালা বাড়ী আছে। তীরের কাছ দিয়া যাইতে যাইতে রবি দেখে, বাড়ীর মালিক একটী মহিলার সঙ্গে উত্তেজিত স্বরে কথা বলিতেছেন। রবি কূলে বোট থামাইয়া ডাকিল—"রমাপতি বাবু!"

রমাপতি সিংজীকে দেখিলে নির্ব্বোধ বলিয়া মনে হয়। যথাসাধ্য বাঙ্গালী বাবু সাজিতে চাহিলেও তাহার মধ্যে কেমন একটা বেমানানভাব দেখা যায়। বর্ত্তমানে চওড়া পাড়ের ধুতি গোলাপী রঙের সিল্কের পাঞ্জাবী ও গোঁফ লাগানো পাম্পসু পরিয়া তিনি মহিলাটীকে রাগতস্বরে বিদায় লইতে বলিতেছিলেন। মহিলাটী বেশ সুবেশা, সুন্দরীও বলা যায়; কিন্তু ললিতা সেনের তুলনায় নয়। তিনিও সরোষে বিদায় লইলেন বলিয়া মনে হইল।

রমাপতি গঙ্গার ধারে আসিয়া নমস্কার করিয়া মুখে হাসি

টানিয়া বলিল—"এই যে দত্ত সাহেব! মেহেরবাণী করকে একটু বৈঠিয়ে যান্। আর মেম্‌সা'বকে লিয়ে চারঠো ফুল!"—এই বলিয়া বড় বড় কয়েকটী গোলাপ ছিঁড়িয়া লইয়া সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গার ধারে আসিয়া রবিকে যথেষ্ট খাতের করিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল। দেখা গেল, লোকটা ভদ্রতার লেশমাত্রও জানেনা। পূর্ব্বেকার মহিলাটি নাকি বাগান দেখিবার উদ্দেশ্যে তাহার শান্তিভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিদায় করিতে সিংজির কি বেগ পাইতে হইয়াছে, তাহাই সে সবিস্তারে বর্ণনা করিল। তারপর রবিদের বিদায় দিয়া ঘাটের চাতালে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিল।

চলিতে চলিতে ললিতা বলিল, "লোকটা তো বড় বোকা!"

"অমনিই ওর স্বভাব। বিশেষ বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। তবে ব্যাপার কি জানেন, যেদিন আমরা প্রসাদকে গ্রেপ্তার করি, সেদিন সে ব্যাঙ্কে ছিল। তাকে ধরতে লোকটা বিশেষ সাহায্য করেছিল। অনন্তবাবু লোকটাকে একটু স্নেহই করেন।"

অনন্ত মল্লিকের ঘাটে আসিয়া বোট থামিলে উভয়ে বাড়ীতে গিয়া দেখিল, মল্লিক মহাশয় একখানি বই পড়িতেছেন। ললিতা বিদায় চাহিলে রবি বলিল—"সাতটা পাঁচের গাড়ীতে যাবেন? আরে, আমিও তো সেই গাড়ীতে যাব!"

মল্লিকের মোটরে চাপিয়া উভয়ে ষ্টেশনে আসিল। পথে রবি প্রশ্ন করিয়া ললিতার ইতিহাস জানিয়া লইল।

ললিতার পিতা পাঞ্জাবে শিক্ষাবিভাগে কাজ করিতেন।

ললিতা একমাত্র সন্তান বলিয়া তাহাকে বহু যত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সে ভারতবর্ষের প্রায় সকল ভাষাই জানিত। তারপর পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হওয়ায় ললিতা সংসার-সমুদ্রে একা ভাসিল। পিতার সঞ্চিত সামান্য অর্থ বসিয়া খাইয়া উড়াইয়া না দিয়া সে প্রথমে মাষ্টারী, এবং পরে মিস্ পল্লীওয়ালের সেক্রেটারীগিরি করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেছে।

রবি সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি উত্তর ব্রহ্মের শান্-ভাষা জানেন?"

ললিতা বিস্মিত হইয়া বলিল—"না, কেন বলুন তো?"

রবি বলিল—"না, এমনি।"

নিজের টিকিট কাটিতে রবি টিকিটঘরে গেল। তারপর ট্রেণ আসিলে একখানা সেকেণ্ডক্লাস গাড়ীতে উঠিবার জন্য ললিতাকে সঙ্কেত করিল। ললিতা আপত্তি করিয়া বলিল, তাহার তো ইণ্টার ক্লাশের রিটার্ণ টিকিটই আছে। রবি হাসিয়া জানাইল, তা হোক্। সে পয়সা দিয়া দু'খানা টিকিট করিয়াছে, তাহা কি বৃথা যাইবে?

অগত্যা ললিতাকে সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতেই উঠিতে হইল।

গাড়ীতে এ-কথায় সে-কথায় বেশ সময় কাটিয়া গেল। সোদপুর ষ্টেশনের কাছেই একটা ভুট্টার ক্ষেত আছে, তার পরেই পিঁজরাপোলের সীমানা। এখানে আসিয়া গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হইল। এমন সময়ে—

ঝন ঝন গুম!

শার্শীর কাঁচ ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। একটা গুলী আসিয়া গাড়ীর ছাদে বিদ্ধ হইল।

ললিতার মুখ ভয়ে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল, কিন্তু রবির মুখে বরঞ্চ উল্লাসের চিহ্নই দেখা গেল। সে বলিল, "আমি বাজী রেখে বল্‌তে পারি, যে গুলী করেছে সে পটোল তুলেছে!"

সোদপুরে গাড়ী থামিতেই রবি নামিয়া পড়িল। ললিতার নিকট বিদায় লইয়া বলিল, "লাসটা সনাক্ত করতে হ'বে।" বলিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ষ্টেশন মাষ্টার ও পুলিশের লোক লইয়া রবি ভুট্টাক্ষেতের দিকে গেল। অল্প খুজিতেই পাওয়া গেল একজন পাঞ্জাবীর মৃতদেহ, তখনো গরম রহিয়াছে। গায়ে একটা ছেঁড়া সৈন্যদের ইউনিফর্ম্ম, পরণে খাকীর প্যাণ্ট। কোটের গায়ে একটা মেডাল ঝুলিতেছে। লোকটা যে পূর্ব্বে সৈন্যদলে ছিল, তাহা বুঝা গেল। পিছন দিক হইতে একটা গুলী আসিয়া মাথার খুলি ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সাম্‌নে একখানা নোট বই পড়িয়া আছে।

রবি নোট বইখানা তুলিয়া লইয়া দেখিল, নাম লেখা আছে—প্রীতম্ সিংহ।" যে পৃষ্ঠায় আসিয়া লেখা শেষ হইয়াছে, সে পৃষ্ঠায় যাহা হিন্দীতে লেখা ছিল তাহার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়:—

"এঞ্জিনের পর তৃতীয় গাড়ী।
দুই নম্বরের জানালা।
জানালার সাম্‌নে মেয়ে বসিয়া থাকিলে গুলী করিও না।"

রবি বলিল, "এ খবর এ লোকটা পেল কেমন করে', সেই তো এক সমস্যা ।"

ষ্টেশনের দিকে তাকাইতেই রবি দেখিতে পাইল, কে যেন প্লাটফরমের দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইয়া একটা খুব জোরাল টর্চ্চ দিয়া দূরে কাহাকে সঙ্কেত করিতেছে। ষ্টেশন হইতে প্রায় সিকি মাইল দক্ষিণে একটা জায়গায় বারাকপুর-ট্রাঙ্ক রোড রেলপথ পার হইয়াছে। রবি আন্দাজ করিল, বোধহয় লোকটা সেখানে কাহাকেও সঙ্কেত করিতেছে। সঙ্কেতের অর্থ এই :—

"সব ভণ্ডুল ।

রবি খুঁজছে ।"

লাসটাকে ষ্টেশনে আনিবার হুকুম দিয়া রবি দত্ত দৌড়িয়া ষ্টেশনে গেল। সঙ্কেতকারী তখন অদৃশ্য হইয়াছে। ষ্টেশনে গিয়া সে আগরপাড়া ষ্টেশনে টেলিফোন করিল। রেল-পুলিশের বড়বাবুকে ডাকিয়া বলিল, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া যত গাড়ী কলিকাতার দিকে আধঘণ্টার মধ্যে যাইবে তাহার নম্বর টুকিয়া রাখিতে। খড়দা ষ্টেশনে টেলিফোন করিয়া সে বলিল, খড়দার দিকে যত গাড়ী যাইবে, তাহারও নম্বর টুকিয়া রাখিতে।

অতঃপর একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া সে কলিকাতায় ফিরিল। আগরপাড়া হইতে ত্রিশখানা গাড়ীর নম্বর পাওয়া গেল, খড়দা হইতে সাতচল্লিশখানা। ইহাদের মধ্য হইতে সে কিছু আবিষ্কার করিতে পারিল কিনা ভগবানই জানেন, কিন্তু বাড়ী যাইবার

সময়ে সে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া কয়েকটী হুকুম দিয়া গেল। রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইয়াছিল।

*　　　*　　　*

পরদিন সকালে খবরের কাগজে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদ বাহির হইল :—

পূর্ব্বতন সৈন্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

১০০০৲ এক হাজার টাকা পুরস্কার

পুলিশের জরুরী ইস্তাহার।

"এদেশের একদল বদমায়েস বে-আইনী কার্য্যের জন্য অবসর-প্রাপ্ত সৈন্যদের নিযুক্ত করিতেছে। পূর্ব্বতন সৈনিকদিগকে জানান যাইতেছে যে ঐ কাজ অতিশয় বিপজ্জনক। ইহাতে তাহাদের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে এবং ভারতীয় সেনাদলের সুনামে কলঙ্ক পড়িবে।

পুলিশ কমিশনারের অনুরোধ, তাঁহারা যেন এইরূপ কোন কার্য্য গ্রহণ না করেন এবং কেহ ঐরূপ অনুরোধ করিলে তাহা পুলিশ কমিশনারকে জানান। উক্ত সংবাদের ফলে বদমায়েস ব্যক্তিদের কাহাকেও যদি গ্রেপ্তার করা যায় বা কারাদণ্ড হয়, তবে সরকার সংবাদদাতাকে একহাজার টাকা পুরস্কার দিবেন।"

দৈনিক মহানন্দ, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫।

সকালে খড়দায় "ষ্টেট্স্‌ম্যান্" পত্রিকা-পাঠ-নিরত রমাপতি সিংয়ের চোখে উক্ত সংবাদ পড়িল। চিন্তায় তাহার ভ্রূকুঞ্চিত হইল। সে টেলিফোন ধরিয়া একটা নম্বর ডাকিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল :—

"আজকার কাগজ দেখিয়াছ ?⋯ ⋯সৈন্যদের দিয়া ত' আর চলিবে না। রবিকে নিকাশ করা বড় শক্ত হইবে⋯⋯হাঁ, বেশ কথা।⋯ঠিক।⋯আগামী সপ্তাহেই তো!⋯ বোধহয় দুজনকেই একসাথে পাওয়া যাবে।"

লালবাজারে বসিয়া গোয়েন্দা অফিসের একজন কর্ম্মচারী "ক্রশ কনেকসন্" করিয়া এই কথোপকথন শুনিল। কিন্তু সে ইহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না, কারণ সমস্ত কথাবার্ত্তাই হইয়াছিল শান্ দেশীয় ভাষায়। যাহা হউক সে আওয়াজমাফিক সর্টহ্যাণ্ড টুকিয়া রাখিয়া দিল। পরের জাহাজেই ব্রহ্মদেশ হইতে একজন বিশেষ গোয়েন্দার আসার কথা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কিরূপ মানসিক অবস্থা লইয়া ললিতা বাড়ীতে ফিরিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া সে যখন মিস্ পল্লীওয়ালের বৈঠকখানায় হাজির হইল, তখন এটর্নী মধুকর গাঙ্গুলী সেখানে আসর জমাইয়া বসিয়াছেন। লোকটীর বয়স বেশী নয়, বত্রিশ-তেত্রিশ হইবে; চালচলনে কবিত্ব-বাতিকের

গন্ধ পাওয়া যায়। বেশভূষার মধ্যে বেশ পারিপাট্য ও সৌখীনতা লক্ষ্য করা যায়।

অপরাহ্ণের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া ললিতা জানাইল "মৃত্যু-বিলাসী"দের কাণ্ডে তাহার যথেষ্ট ভয় হইয়াছে।

মিস্ পল্লীওয়াল ব্যাপারটাকে গাঁজাখুরী বলিয়াই উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমাপতি সিংকে কেমন দেখ্‌লে?"

ললিতা উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। একটা লোকের সঙ্গে মাত্র দুমিনিটের দেখা। এই দুমিনিটের পরিচয়ের উপরে নির্ভর করিয়া কোন মতামত দেওয়া কি উচিত?

উত্তর অবশ্য দিতে হইল না, কারণ মিস্ পল্লীওয়াল্ নিজেই বলিলেন, "লোকটা অত্যন্ত স্বার্থপর।" ললিতা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "প্রতি বৎসর মধুপুরেই দেখা হয়।"

মধুকর গাঙ্গুলী বলিলেন—"দল বেঁধে প্রতিহিংসা নেওয়া এদেশের প্রকৃতি নয়। প্রসাদ তো একাই যা' কিছু করার, করতো। আর, কেনই বা দল বাঁধবে? প্রতিহিংসা নেবার উদ্দেশ্যই বা কি? যদি এমন কেউ থাকত' যে প্রসাদকে অত্যন্ত ভালবাসে, সেই হয়ত প্রতিহিংসা নিতে চাইত। কিন্তু প্রসাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কেউ নেই।"

মিস্ পল্লীওয়াল বলিলেন—"তার কেউ নেই, এইটেই সব চেয়ে আনন্দের কথা। তারপর হাসিয়া—বোধহয় কথার গতি ফিরাইবার

জন্যই ললিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "এ সব তোমার ডিটেক্‌টিভের কল্পনার আতিশয্য।"

ললিতার মনে হইল, মিস্ পল্লীওয়াল রবির প্রতি অবিচার করিতেছেন। সে একটু উত্তপ্ত হইয়াই বলিল, "কখনো নয়। তিনি একেবারেই কল্পনাপ্রিয় বা হুজুগপ্রিয় নন।"

মধুকর এতক্ষণ সরু গোঁফে তা' দিতে দিতে ললিতাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি এবার ললিতার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, "মিস্ সেনের কথাই ঠিক। রবি দত্ত ঠিক অন্য গোয়েন্দার মত না হ'লেও লোক হিসাবে খুবই খাঁটী। তবে সকলে তাকে পছন্দ করে না সে বড় লোকের ছেলে বলে'।"

আহারের পর বিষয়-সম্পত্তির বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য মিস্ পল্লীওয়াল মধুকরকে লইয়া আপিস ঘরে প্রবেশ করিলেন। ললিতা শয়ন-গৃহে গিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল. কিন্তু উত্তপ্ত-মস্তিষ্কে ঘুম আর আসিতেই চাহে না।

রাত্রি তখন প্রায় একটা। মিস্ পল্লীওয়াল ললিতার দরজার সামনে আসিয়া ডাকিলেন, "ললিতা!" তাহার তখন সবে তন্দ্রা আসিয়াছে, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। মিস্ পল্লীওয়াল ঘরে ঢুকিয়া ললিতাকে বলিলেন, "মধুকর তোমার সঙ্গে ভালো করে' আলাপ করতে চায়। সে তোমাকে ভালবাসে, তোমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক।"

ললিতা স্তম্ভিত হইয়া গেল। মিস্ পল্লীওয়াল বলিলেন, "আমি অবশ্য তাকে বলেছি যে, তাতে আমার মতামত কিছুই নেই

আর আমি তার' হ'য়ে তোমাকে ভজাতে পারবো না। বিয়ে করবে কি না করবে, সে তোমার এবং তা'র পরস্পর ব্যাপার।"

এই বলিয়া মিস্ পল্লীওয়াল চলিয়া গেলেন।

*   *   *   *

পরদিন লালবাজারে কর্ণফোর্ড সাহেব, পুলিশ কমিশনার এবং লাটসাহেবের চীফ্ সেক্রেটারী—এই তিনজন বসিয়া চিন্তিত-মুখে রবি দত্তের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। কথোপকথনের বিষয়-বস্তু ছিল এই—সত্যকারের "মৃত্যুবিলাসী" বলিয়া কেহ আছে কিনা, এবং থাকিলে তাহারা—প্রসাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ তুলিতেছে কি না। পুলিশ কমিশনার ব্যাপারটাকে উড়াইয়া দিতেই চাহিতেছিলেন। চীফ্ সেক্রেটারী অর্দ্ধেক বিশ্বাস অর্দ্ধেক অবিশ্বাস এমনি অবস্থার মধ্যে; এক কর্ণফোর্ড সাহেবই সোৎসাহে রবির পক্ষ সমর্থন করিয়া তর্ক করিতেছিলেন।

কিন্তু রবি যখন এক এক করিয়া সমস্ত ঘটনা সকলের গোচরে আনিল, তখন সকলের মুখই চিন্তায় গম্ভীর হইল। প্রথমতঃ, অনন্ত মল্লিকের ভাইয়ের মৃত্যু। তারপর প্রসাদকে যাঁহারা বিচার করিয়াছিলেন,—সেই দুইজন হাইকোর্টের জজের মৃত্যু। একজন মরিয়াছিলেন প্রেগ হইয়া, অপরজন সিমলায় আত্মহত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। সরকারী উকীল রায় বাহাদুর মৈনাক মুখুজ্যে সহসা মেনিনজাইটিস হইয়া মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার সহকারী বীরেন্ বসু একদিন রাত্রে মোটর চালাইতে গিয়া লেকের মধ্যে মোটরসহ সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছেন।

এমন কি যে লোকটা প্রসাদকে ফাঁসী দিয়াছিল, সে জল্লাদও শীতকালে বসন্ত হইয়া মারা গিয়াছে। এখন বাকী কেবলমাত্র রবি, অনন্ত মল্লিক ও রমাপতি সিং। রবির উপরে ইতিপূর্ব্বেই দুইবার আক্রমণ হইয়া গেছে, সৌভাগ্যক্রমে প্রাণ যায় নাই। অনন্ত মল্লিকের উপরে আক্রমণ উদ্যত। রমাপতি সিং নির্ব্বোধ, এবং সে যে-টুকু সাহায্য করিয়াছিল, তাহা আকস্মিক। তাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ দুই এক সপ্তাহের মধ্যে বলিতে পারিবে রবি বলিল।

পুলিশ কমিশনার যেন তথাপিও কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তিনি বলিলেন, "অন্য মৃত্যুগুলি স্বাভাবিক এবং রবিকে হত্যার চেষ্টা বিপ্লবীদের কাজ।"

চীফ্ সেক্রেটারী বলিলেন, "রবি তো রাজনৈতিক বিভাগের গোয়েন্দা নয়, যে বিপ্লবীরা তাহাকে সরাইবার চেষ্টা করিবে! বিশেষ, তাঁহার এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, "মৃত্যু-বিলাসী" নামেই হউক বা অন্য নামেই হউক, একটা হত্যাকারীর দল প্রসাদের মৃত্যুর শোধ তুলিতেছে। তাঁহার একান্ত অনুরোধ, পুলিশ কমিশনার এই ব্যাপারের তদন্তে যেন যথাসাধ্য সাহায্য করেন।"

বড়কর্ত্তা দুইজনে চলিয়া গেলে পর কর্ণফোর্ড সাহেব একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, "যাহোক, চীফ্ সেক্রেটারী আমাদিগকে বাঁচাইয়া দিয়া গেল! নহিলে পুলিশ কমিশনার যে কি করিতেন, বলা যায় না।" এই বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনন্ত মল্লিককে পাহারা দেওয়ার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে?"

রবি বলিল, "খড়দার বাড়ীর ধারে দুই জন গোয়েন্দা বসান হইয়াছে, কলিকাতার বাড়ীতে দুই জন, ব্যাঙ্কে দুই জন এবং তাঁহার গাড়ীর ড্রাইভার বদলাইয়া পুলিশের লোককে ড্রাইভার নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু স্যার, আমার মনে হয় বিপদটা কলিকাতায় নহে। আগামী সপ্তাহে অনন্তবাবু মধুপুরে হাওয়া বদলাইতে যাইবেন, বিপদ সেইখানেই বলিয়া মনে হয়।"

"অনন্তবাবুর কি মধুপুরে বাড়া আছে?"

রবি বলিল, "না, উনি প্রতি বৎসরই "নন্দন-স্যান্যাটোরিয়ামে" ওঠেন। প্রতিবার পূজার সময়ে একটা টেনিস্ প্রতিযোগিতা হয়, সেই উপলক্ষে স্যানাটোরিয়ামে বহু বড় লোকের আমদানী হয়। আমি এ সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি, তাহা আপনাকে এখন বলিব না স্যার, পরে বলিব।"

এই বলিয়া রবি চলিয়া যাইতেছিল, মিঃ কর্ণফোর্ড তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"রবি একটা জিনিষ তুমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি? প্রসাদ কোনদিন তোমার বাবার ব্যাঙ্ক হইতে জালিয়াতী করিয়া টাকা লয় নাই।"

রবি আশ্চর্য হইয়া গেল। তাই তো, একথা তো সে কখনো ভাবে নাই! সত্যই তো!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চরিয়া খাইবার উপদেশ দিবার পর হইতে রবিদের পিতাপুত্রে বড় সাক্ষাৎ হইত না। প্রথমতঃ, উভয় পক্ষেই একটু অভিমান জন্মিয়াছিল। মাতৃহীন একমাত্র সন্তান শুধু মুখের কথায় গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, ইহাতে রায় বাহাদুর বিনকৃষ্ণ দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। রবিও দারুণ অভিমান করিয়া পুলিশে ভর্ত্তি হইয়াছিল। একবৎসর পরে অবশ্য অভিমান কাটিয়া গেল, কিন্তু পিতাপুত্রে দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা হইত না। রবি কাজে-কর্ম্মে এত ব্যাস্ত থাকিত যে, পিতার সহিত প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতে পারিত না। এই জন্য দু'মাস ছ'মাস অন্তর যখন দেখা হইত, তখন রায় বাহাদুর অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন।

কর্ণফোর্ড সাহেবের সহিত পূর্ব্ব অধ্যায় বর্ণিত কথোপকথনের দিন, সন্ধ্যার পরেই রবি পিতার সহিত দেখা করিল। শম্ভুনাথ পণ্ডিত রোড্ ও হরিশ মুখুজ্যে রোডের সংযোগস্থলের কাছেই রায় বাহাদুরের বাড়ী। বাড়ীখানী প্রকাণ্ড না হইলেও বেশ বড়, এবং অন্যান্য অনেক আধুনিক বাড়ীর মত কিম্ভূতকিমাকার নহে। দেখিলেই মনে হয়, বাড়ীর মালিক রীতিমত ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং আশপাশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাসের জন্য বাড়ী করিয়াছেন।

রবি যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, রায় বাহাদুর তখন অবসর

বিনোদনের জন্য শ্রীঅরবিন্দের গীতার ভাষ্য প'ড়তেছেন। বস্তুতঃ রায় বাহাদুর লোকটা একটু অসাধারণ; তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেই মনে হয়, তাঁহার জীবনে সুখদুঃখের তরঙ্গাঘাত আজ একটা বিরাট প্রশান্তির মধ্যে গিয়া বিলীন হইয়াছে। রবিকে দেখিয়াই তিনি সানন্দে বলিলেন, "এস রবি, আজ ক'দিন তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

রবি ভূমিকা না করিয়াই বলিল, "আচ্ছা বাবা, তোমার ব্যাঙ্ক থেকে প্রসাদ কখনো জালিয়াতি করে টাকা নেয়নি কেন?"

রায় বাহাদুর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তা'তো জানি না।" কিন্তু কথার স্বরে দৃঢ়তার অভাব পরিলক্ষিত হইল। "বোধ হয় আমাদের ব্যাঙ্ক ছোট ব'লেই নেয়নি।" এই বলিয়া কথাটা ঘুরাইয়া তিনি বলিলেন, "রবি এ কাজ কেন ছেড়ে দাও না? তুমি যে মৃত্যু-বিলাসীদের কথা আমাকে লিখেছিলে, সে-দল যদি সত্যই থাকে, তবে তো তোমার জীবনের আশঙ্কা আছে। আর তোমার এ চাকরী করবার দরকারই বা কি? তোমার অভাব কিসের? যদি কাজই করতে চাও, আমার ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর করে দিচ্ছি তোমাকে। যদি দেশ-বিদেশ দেখতে চাও, আমার ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হ'য়ে সিঙ্গাপুর, চীন, জাপান সব দেশেই ঘুরে আসতে পার।"

রায় বাহাদুর আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পুত্রের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া থামিয়া গেলেন। রবি বলিল, "বাবা এই তদন্ত থেকে সরাবার জন্য তোমার আগ্রহ আমি আগেই

লক্ষ্য করেছি। গত বৎসরও তুমি আমাকে এমনি একটা কথা বলেছিলে। কেন বল ত?"

রায় বাহাদুর ছেলের মুখের দিকে না চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন, যেন রবির প্রশ্নটা অত্যন্ত হাস্যকর। কিন্তু সে হাসির মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল না, তাহা রবি বেশ ধরিতে পারিল। রায় বাহাদুর বেয়ারা ডাকিয়া চা দিতে বলিলেন। অতঃপর পিতাপুত্রে অন্যান্য বিষয়ের কথা হইল।

আহারাদি শেষ করিয়া রবি যখন বিদায় লইল, তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। রায় বাহাদুর পুত্রকে সদর দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিলেন। রাস্তায় লোক চলাচল তখন বন্ধ, কেবল দুই একখানি মোটর গাড়ী ও ট্যাক্সি যাওয়া-আসা করিতেছে। রসা রোডের দিকে রবি প্রায় এক রশি অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে সে দেখিল, একজন রমণী দৌড়িয়া সেই দিকে আসিতেছে। রবি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, ব্যাপার কি? স্ত্রীলোকটা দৌড়ায় কেন? হঠাৎ—

ফট্—ফট্!

দুইটী পিস্তলের গুলি সাঁ সাঁ করিয়া রবির কাণ ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। কে যেন সাইলেন্সার পরানো পিস্তল লইয়া গুলী চালাইতেছে। রবি সামনে চাহিয়া দেখিল, কিছুদূরে রাস্তায় কে একটী লোক দাঁড়াইয়া আছে। সে ভাবিল, তাহারা কি রমণীকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিতেছে? দ্বিতীয় গুলীটি তাহার পাশেই একটা গাড়ী বারান্দার থামে গিয় বিদ্ধ হইয়াছিল, দেখিয়া

তাহাব কোন সন্দেহই রহিল না যে, গুলী তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই। নিমেষের মধ্যে সে পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া গুলী করিবার পূর্ব্বেই পলায়মান রমণীটি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাঁচান, বাঁচান। ঐ মৃত্যু-বিলাসীরা ……"বলিয়া রমণী অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

স্ত্রীলোকটীর হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে রবির একটু সময় লাগিল। ততক্ষণে অজ্ঞাত আততায়ী অদৃশ্য হইয়াছে। রিভলভারটা পকেটে পুরিয়া রবি স্ত্রীলোকটীকে আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইল। এমন সময়ে পদশব্দ শুনিয়া পিছনে চাহিয়া দেখে, তাহার পিতা দুইজন ভৃত্যসহ আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? গুলীর শব্দ শুনলাম যেন।"

রবি সায় দিয়া বলিল, "হাঁ।" সকলে ধরাধরি করিয়া মূর্চ্ছিতা স্ত্রীলোকটীকে রায় বাহাদুরের বাড়ীতে লইয়া গেল। স্ত্রীলোকটী যুবতী, চেহারা সুন্দরই বলা যাইতে পারে। মাথায় সিন্দুরের চিহ্ন নাই, হাতে শাঁখাও নাই, কিন্তু বেশভূষার পারিপাট্য যথেষ্ট। রবির মনে হইতে লাগিল, স্ত্রীলোকটীকে সে যেন কবে কোথায় দেখিয়াছে, কিন্তু ঠিক মনে করিয়া উঠিতে পারিল না। প্রথমবার তীব্র বিদ্যুতালোকে তাহাকে দেখিয়া রায়বাহাদুর যেন সর্পাহতের মত চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইলেন। সৌভাগ্যক্রমে কেহই তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না।

রবি যুবতার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মূর্চ্ছিত হইয়াছে, কিন্তু নাড়ীর গতির কোন বৈলক্ষণ্য নাই। দুধের সঙ্গে একটু কস্তুরী মাড়িয়া খাওয়াইয়া দিতে যুবতী ধীরে উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"আমি কোথায় ?"

এইবার রবির মনে পড়িল, কোথায় তাহাকে দেখিয়াছিল। সেইদিন, রমাপতি সিংয়ের বাগানে! রবি রমণীর বেশভূষা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল। নীচু করিয়া কাটা গাঢ় গোলাপী রংয়ের 'ব্লাউজ' চাঁপা রংয়ের বক্ষোদেশের উপরিভাগটাকে যেন বেশী সুন্দর করিয়া দেখানোর উদ্দেশ্যেই পরা। রেশমী শাড়ার রং আশ্‌মানী নীল, কাঁধের উপরে একটা হীরার ব্রুচ্‌ দিয়া আট্‌কানো। গলার প্ল্যাটিনামের সরু নেকচেন, তাহাতে একটা হীরার ধুক্‌ধুকি ঝোলানো। হাতে দু'তিনটি আংটী, তাহাও হীরক খচিত। পায়ে অক্‌সব্ল্যাড (রক্তের মত লাল) রংয়ের হাই-হিলতোলা জুতা। কাণে পাথরবসানো ঝুম্‌কি, বাম মণিবন্ধে ক্ষুদ্র হাতঘড়ি, দুই বাহুতে নব্য ফ্যাসানের চুঁড়। মুখখানি প্রসাধন বাহুল্যে সুপক্ক পিচ্‌ফলের মত শ্বেত-রক্তিম। চোখদুটী আরও উজ্জ্বল, ভ্রূভঙ্গী বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, কেবল ঠোঁট দুটিতে কোমলতার অভাব। মোটের উপর দর্শনীয় জিনিষ, সন্দেহ নাই।

রবি দেখিল, রায়-বাহাদুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রমণীর দক্ষিণ হাতের দিকে চাহিয়া আছেন!

রমণী যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই। সে মধুপুরে থাকে, কলিকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আসিয়াছিল। নিউ

এম্পায়ার থিয়েটারে বায়োস্কোপ দেখিয়া সে বাড়ী ফিরিবার জন্য বাসে চড়িয়া রসারোডের মোড়ে নামিয়া দু'পা আগাইয়াছে, এমন সময়ে একখানা ঢাকা মোটর গাড়ী তাহার কাছে আসিয়া থামিল। গাড়ী হইতে দু'জন মুখোসপরা লোক নামিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া গাড়ীতে পুরিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা তাহাকে প্রায় গাড়ীতে টানিয়া তুলিয়াছে, এমন সময়ে গাড়ীর ভিতর হইতে একজন লোক বলিয়া উঠিল—"সব গাধার দল! এ তো ললিতা সেন নয়!" এ কথায় তাহারা একটু অসাবধান হইতেই যুবতী দৌড়িয়া পালাইল। তারপর শুলী।

ললিতার নাম শুনিয়া রবি একটু চমকাইল। কিন্তু সে মাত্র মুহূর্ত্তের জন্য। তারপর নোটবুক বাহির করিয়া সে বলিল—"এইবার আপনার নাম-ঠিকানা চাই।"

যুবতী বলিল, "আমার নাম নীলিমা রায় চৌধুরী। আমার দাদা হরনাথ রায়চৌধুরী মধুপুরের নন্দন স্যানাটোরিয়মের মালিক।"

রবি আরো আশ্চর্য্য হইল। আবার নন্দন স্যানাটোরিয়াম!

"মিস্ রায় চৌধুরী, আপনি ললিতা সেনকে জানেন?"

"হাঁ জানি। মিস্ সেন মিস্ পল্লাওয়ালের সেক্রেটারী। তাঁরা যে প্রতিবৎসর পূজার সময়ে নন্দনে যান্।"

"আপনি কল্‌কাতায় কোথায় উঠেছেন?"

যুবতী হরিশ মুখুজ্যের রোডের একটা ঠিকানা বলিল। রবি বলিল, "আপনার জন্য একখানা ট্যাক্সি ডেকে দিই।" এই বলিয়া এল্‌গিন রোডের মোড়ে গিয়া একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া

আনিল। কলিকাতায় ডাকাতির হিড়িক পড়িবার পর হইতে পুলিশ কতকগুলি বিশ্বস্ত লোককে ট্যাক্সি দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাঙালী, শিখ, মুসলমান সবই আছে, এবং ইহারা সাধারণতঃ রাত্রেই বাহির হয়। পুলিশের কাজে ইহারা যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। রবি এইরূপ একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাকে বলিয়া দিল, যুবতী কোথায় যায়, তাহা যেন তাহার কাছে অবিলম্বে রিপোর্ট করে।

নীলিমা রায়কে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া রবি পিতার নিকট বিদায় লইল। সে দেখিল, রায় বাহাদুর একটা সিগার মুখে দিয়া ঘন ঘন টানিতেছেন। সে বুঝিল, পিতা কোনও কারণে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, কারণ, রায় বাহাদুর সাধারণতঃ তামাক বা সিগারেট ব্যবহার করিতেন না।

ট্যাক্সি ধরিয়া বাসার দিকে যাইতে যাইতে রবি অনেক কথাই ভাবিল। কে ওই রমণী? মৃত্যু বিলাসীদের নাম এ কেমন করিয়া জানিল? এ যুবতীকে যে কেহই ললিতা বলিয়া মনে করিবে, রবির তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইল। ললিতা এর চেয়ে লম্বা, তাহার হাঁটা চলার ধরণই বিভিন্ন। রবি সিদ্ধান্ত করিল, রমণীটি মিথ্যাকথা বলিয়াছে। কিন্তু এই ঘটনাটার অর্থই বা কি? অনন্ত মল্লিক···মিস্ পল্লীওয়াল···রমাপতি···নীলিমা রায়··· হরনাথ। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই ব্যাপার!

নবম পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে ব্রহ্মদেশ হইতে একজন গোয়েন্দা কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সিঙ্গাপুর, ইন্দোচিন ও উত্তর ব্রহ্ম ঘুরিয়া মৃত্যু-বিলাসীদের সম্পর্কে যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া রবির চক্ষুস্থির হইয়া গেল। এতদিন যে সকল কথা তাহার নিকট একেবারেই হেঁয়ালি বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহার অর্থ বুঝিতে পারিয়া সে স্তম্ভিত হইল তারপর, শান্‌-ভাষায় টেলিফোনে যে সকল কথাবার্ত্তা শর্টহ্যাণ্ডে পুলিশ টুকিয়া রাখিয়াছিল, তাহার অর্থও মিলিল।

সেই দিন দুপুরে রবি, মিঃ কর্ণফোর্ড এবং পুলিশ-কমিশনার এই তিনজনে মিলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ হইল। অপরাহ্নে দেখা গেল, লরী বোঝাই করিয়া পুলিশ অনন্ত মল্লিকের ব্যাঙ্ক ঘেরাও করিয়াছে। কিন্তু অনন্ত মল্লিক ব্যাঙ্কেও নাই, কলিকাতায়ও নাই। পুলিশ খড়দার বাড়ীতে হানা দিল। অনন্ত সেখানেও নাই। খোঁজ-খবরের সূত্র ধরিয়া পুলিশ সেই রাত্রেই বাস-এ করিয়া মধুপুরে নন্দন স্যানাটোরিয়মে গিয়া শুনিল, অনন্ত আসিবেন বলিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু আসিয়া পৌঁছেন নাই।

তার পরদিন সকালে খড়দার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ লাইব্রেরী-ঘরের টেবিলের উপরে এক পত্র পাইল। তাহাতে

লেখা ছিল অনন্ত স্বেচ্ছায় গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতেছে, এজন্য কেহ দায়ী নয়।

সেই দিন সন্ধ্যায় "মহানন্দ" পত্রিকার বিশেষ সংস্করণে বাহির হইল :—

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের শোচনীয় পরিণাম।

গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা!!

—:*:—

অনন্ত মল্লিকের কাণ্ড।

—০—

সমস্ত সম্পত্তি অনাত্মীয়া যুবতীকে দান

—০—

"এশিয়াটিক ব্যাঙ্কের ম্যানজার অনন্ত মল্লিক গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও লাশ খুঁজিয়া পায় নাই।

"অনন্ত মল্লিক কেন যে আত্মহত্যা করিল, তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ব্যাঙ্কের হিসাবে কোন গণ্ডগোল নাই। তাঁহার এটর্নী শৈলেন ঘোষের নিকট সবিশেষ সংবাদ লইয়া জানা গিয়াছে, তাঁহার কোনরূপ দেনা-দায়িকও নাই। তিনি অবিবাহিত, কোনরূপ চরিত্রদোষও নাই। সুতরাং তাঁহার মৃত্যু গভীর রহস্যাবৃত।

"মহানন্দ" পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি খড়দায় তদন্ত করিয়া টেলিফোনে যে সংবাদ জানাইয়াছেন, তাহাতে এই দুর্ভেদ্য রহস্যের

উপরে কিছু আলোকপাত হয়। প্রকাশ, অনন্ত মল্লিক গত একবৎসর ধরিয়া সর্ব্বদা হত্যাভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতেন। "মৃত্যু-বিলাসী" নামে একদল ভয়ঙ্কর লোক নাকি তাঁহাকে খুন করিবে বলিয়া শাসাইত। মৃত ব্যক্তির প্রতিবাসী বাবু রমাপতি সিংজি বলেন, ঐ দল নাকি প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক জালিয়াত ডি, আর. প্রসাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ তুলিতে বদ্ধপরিকর। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, অনন্ত মল্লিক প্রসাদের গ্রেপ্তারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

"কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে এই যে, তিনি তাঁহার পাঁচলক্ষ টাকার সম্পত্তি মিস্ ললিতা সেন নামক এক নিঃসম্পর্কিতা যুবতীকে দান করিয়া গিয়াছেন। ১০৪ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটের এটর্নী মিঃ মধুকর গাঙ্গুলী প্রকাশ করিয়াছেন, গতকল্য দুপুরে অনন্ত মল্লিক তাঁহার আপিসে গিয়া যথারীতি উইল সম্পাদন করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। উইলের সাক্ষী মৃতব্যক্তির প্রতিবাসী রমাপতি সিংজী এবং মধুকর বাবু স্বয়ং।

"পুলিশ কেন অনন্ত মল্লিককে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই—কারণ পুলিশ কমিশনার সাহেব সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিবৃতি করিতে অসম্মত হইয়াছেন। আমাদের অনুমান হয়, বিপ্লববাদের সহিত সংশ্রব আছে বলিয়াই পুলিশ তাঁহার খোঁজ করিতেছিল।"

সন্ধ্যার পর এই সংবাদ পাঠ করিয়া ললিতা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সেই সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ, যাঁহাকে দেখিলে মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়—তাঁহার এই পরিণাম! আর মৃত্যুকালে তিনি এমনি করিয়া

তাহাকে জড়াইয়া গেলেন! ললিতার মনে আপনা হইতেই একটা প্রবল আশঙ্কার উদয় হইল—এই অর্থের সঙ্গে মৃত্যু-বিলাসীদের যেন একটা সংযোগ রহিয়াছে। হায়, এ জটিলতার মধ্যে কে তাহাকে সদ্‌বুদ্ধি দিবে? ললিতা কাঁদিতে লাগিল। মিস্ পল্লীওয়াল বহু সান্ত্বনা দিয়া তাহাকে ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিলেন।

ঘরে গিয়াও ললিতা ঘুমাইতে পারিলনা। স্বর্গগত মাতা পিতার নাম ধরিয়া সে আকুল মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল, তাঁহারা যেন স্বর্গ হইতে আসিয়া ললিতাকে কি কর্তব্য, বুঝাইয়া দিয়া যান। এমন তন্ময় হইয়া সে প্রার্থনা করিতেছিল, যে গভীর রাত্রে মধুকরের গাড়ী আসিবার শব্দ, তারপর মিস্ পল্লীওয়ালের আহ্বান, কিছুই তাহার কানে ঢুকিল না। মিস্ পল্লীওয়াল তাহাকে নিদ্রিতা মনে করিয়া ফিরিয়া গেলেন।

সারারাত্রি এপাশ-ওপাশ করিয়া ললিতা ভোরের পাখীর প্রথম ডাকের সঙ্গেই উঠিয়া রাস্তার ধারের জানালা খুলিয়া দাঁড়াইল। ল্যান্সডাউন্ রোড্ তখন সুষুপ্তিমগ্ন। বাড়ীগুলাও যেন এইমাত্র সুষুপ্তির আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। শরতের শীতল বাতাস স্বর্গগত পিতামাতার আশীর্বাদের মতই যেন তাহার চুলের মধ্য দিয়া স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দিতে লাগিল। ললিতার মনে হইতে লাগিল, তাহার দুঃখ-ভাবনা ক্ষণস্থায়ী, বিহগ-সঙ্গীত-মুখর আনন্দোজ্জ্বল প্রভাত সম্মুখেই।

সহসা সে লক্ষ্য করিল, ঠিক সম্মুখের ফুটপাথ দিয়া কে যেন তাহাকে ইঙ্গিত করিতেছে। সে চিনিল, রবি দত্ত। একটা

ড্রেসিং গাউন পরিয়া সে নীচের বাগানে রাস্তার ধারে রেলিংয়ের কাছে আসিল। রেলিংয়ের ওপাশ হইতে রবি বলিল, "মিস্ সেন, আজ বিকালে তিনটার সময়ে চৌরঙ্গিতে ন্যাশনাল্ ষ্টোর্সে আমার সঙ্গে অবশ্য অবশ্য দেখা করবেন। আর দেখুন, আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা না হওয়া পর্য্যন্ত কাউকেই সম্পত্তির আমমোক্তার-নামা দেবেন না--মধুকর গাঙ্গুলীকে তো নয়ই।"

ললিতা বলিল, "সম্পত্তি আমি নেব না, হাসপাতালের জন্য দান করব।"

রবি উত্তেজিত-স্বরে বলিল, "সে যা করবেন, করবেন—কিন্তু আমার সাথে তার আগে দেখা হওয়া চাই-ই। ললিতা, আমায় কথা দাও।" রবি এতটা আবেগের সঙ্গে কথা কহিতেছিল যে সম্বোধন একেবারে "আপনি" হইতে "তুমি"তে নামিয়া গেল।

ললিতা কথা দিল। যাহাকে মন দিয়াছে, তাহাকে এই কথা দিবে, তাহার মধ্যে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? বরঞ্চ, রবি যে তাহাকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, ইহাতেই তাহার মনে একটা আনন্দের কাঁপন লাগিয়া গেল! কি জানি কেন, তাহার মনে হইতে লাগিল, রবির মুখ দিয়াই তাহার মাতাপিতার আদেশ বাহির হইয়াছে, রবির আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেই তাঁহারা সুখী হইবেন। ললিতার বুকের ভার নামিয়া গেল। সে শয়ন ঘরে ফিরিয়া গিয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িল। এইবার প্রকৃতি দেবী প্রতিশোধ লইলেন—ললিতা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ

ললিতা যখন ঘুম হইতে উঠিল, তখন বেলা দশটা বাজিয়াছে। প্রথম ঘুম ভাঙ্গিতেই সে মনে যে-স্বাচ্ছন্দ্যটুকু অনুভব করিতেছিল, মিস্ পল্লীওয়ালের ডাকে যেন তাহার সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়া তাহার মন অনন্ত মল্লিক ও তাঁহার টাকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। আবার অস্বস্তিতে তাহার মন ভারী হইয়া উঠিল। সে বেশভূষা গুছাইয়া বৈঠকখানায় গিয়া দেখে, মধুকর গাঙ্গুলী আসর জমকাইয়া বসিয়া আছেন। মিস্ পল্লীওয়াল সাদরে ললিতাকে কৌচে বসাইলেন।

ললিতা লক্ষ্য করিল, মিস্ পল্লীওয়াল তাঁহাকে অত্যন্ত আদর-যত্ন করিতেছেন। টাকার অসীম শক্তির কথা ভাবিয়া সে দুশ্চিন্তার মধ্যেও কৌতুক অনুভব করিতে লাগিল। মিস পল্লীওয়াল প্রথমে তাঁহার অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন,—"ললিতা, তুমি বয়ঃপ্রাপ্তা, বুদ্ধিমতী। আজ তুমি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। এত টাকা এবং সম্পত্তি তুমি নিজে তদারক করতে পেরে উঠবে না। এর ভার কোন যোগ্য লোকের হাতে দেওয়াই সমীচীন।"

ললিতা বলিতে যাইতেছিল, সমস্ত সম্পত্তিই সে মেয়ে হাসপাতালের জন্য দান করিবে, কিন্তু রবির কথা স্মরণ হইতেই কথাটা চাপিয়া গেল। মিস্ পল্লীওয়াল বলিলেন, "মধুকরের

ইচ্ছা, সে তোমার সম্পত্তির তদারক করে। আমারও মনে হয়, মধুকর অযোগ্য লোক নয়।”

পকেট হইতে দুইখানি দলিল বাহির করিয়া মধুকর টেবিলের উপরে রাখিল। তারপর বলিল, “আমি সব লেখাপড়া স্থির ক’রেই রেখেছি, মিস্ সেন সই করলেই হয়।”

ললিতা বলিল, “এত তাড়াতাড়ির দরকার কি? আমাকে আপনারা একটু ভেবে দেখ্‌তে দিন্। আমার মনের এখন যা অবস্থা, তা’তে কিছুই স্থির করতে পারছি না। অন্ততঃ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাকে সময় দিন, ভেবে’ যাহোক্ স্থির করব।”

মিস্ পল্লীওয়াল যেন একটু বিরক্ত হইলেন। কিন্তু মধুকর হাসিয়া কহিল, “তাই হোক, ভেবেই দেখবেন। আমার কাল পেলেও ক্ষতি নেই।” অল্পক্ষণ পরে মধুকর বিদায় হইল।

* * * *

দুইটার পর ললিতা মিস্ পল্লীওয়ালের নিকটে বিকালের জন্য ছুটী চাহিল। মিস্ পল্লীওয়াল বলিলেন, “মা, (এই সম্বোধনটা নূতন) আজ তুমি আর আমার চাকর নও। তোমার সব সময়েই ছুটী। তা তুমি যাবে কোথায়? আমার গাড়ী নিয়েই যাওনা?”

মিথ্যা কথা বলা ললিতার অভ্যাস নয়, তবু সে এবার সত্য কথা বলিতে পারিল না। সে বলিল, “মনটা বড় খারাপ আছে, একটু মাথাও যেন ধরেছে। গড়ের মাঠে একটু হাঁটলে যদি ভাল বোধ হয়, এই জন্য বেরুচ্ছি। তাই হেঁটেই যাবো।”

এস্‌প্লানেডের উপরেই প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ীতে ন্যাশন্যাল ষ্টোর্স। তিনটার সময়ে ললিতা এই বিপুল দোকানে ঢুকিয়া বুঝিল, রবির সঙ্গে তাহার দেখা হওয়ার আশা সুদূরপরাহত। যাহাহউক, খুঁজিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে সে দোতলার উঠিয়া খানিক-দূর আগাইয়াছে, এমন সময়ে দোকানের একজন কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল, "নমস্কার, আপনার ব্যাগ্‌টা পাওয়া গেছে।"

ললিতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমার ব্যাগ্‌ তো চুরি যায় নি!"

কর্ম্মচারীটি সবিনয়ে জানাইল, তাহাকে ম্যানেজারের আপিসে লইয়া যাইবার আদেশ আছে। অগত্যা ললিতা ম্যানেজারের খাস-কামরায় যাইতে বাধ্য হইল, কারণ ম্যানেজারকে অন্ততঃ একথা বলিয়া আসিতে হইবে যে, যে-ব্যাগটা পাওয়া গিয়াছে সেটা তার নয়।

ঘরে ঢুকিয়া সে দেখে, ম্যানেজারের পাশে বসিয়া আছে রবি দত্ত। দুইজনের মুখে পরস্পরের দর্শনে যে-ভাবটা ফুটিয়া উঠিল, তাহার অর্থ বুঝিতে বালকেরও দেরী হয় না, ম্যানেজারের মত ঝানুলোকের 'কা কথা'। ব্যাগ্‌ হারাইবার তাৎপর্য্য এইবার ললিতার হৃদয়ঙ্গম হইল।

খাস্‌-কামরার পিছনে একটা ছোট ঘর আছে, সেটা দোকানের মালিকদের গোপনীয় ঘর। ললিতাকে সেখানে লইয়া গিয়া রবি বলিল, "ললিতা, তোমার সঙ্গে এত গোপনে দেখা করতে হ'চ্ছে এজন্য আমি বড় লজ্জিত। কিন্তু তুমি জানো না,

একজন চর তোমার পিছু নিয়েছিল। আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে এটা প্রকাশ পেলে সব মাটী হ'ত।"

ললিতা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এর মধ্যেই কি মৃত্যু-বিলাসীরা পিছু নিয়াছে? সে প্রশ্ন করিল, "আপনি সত্যি বলছেন?"

রবি বলিল, "সে লোকটাকে যে চিনি! এই সেদিন হ'ল সে খালাস পেয়েছে।" এই বলিয়াই সে কোন ভূমিকা না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "মধুকর তোমাকে ক'খানা দলিল সই করতে বলছে?"

আশ্চর্য্য হইয়া ললিতা বলিল, "আপনি জানলেন কি ক'রে?

রবি সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "তুমি কোন কাগজে সই করেছ?"

"না।"

রবি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর দৃঢ়স্বরে বলিল, ললিতা, তুমি কোন কাগজ সই ক'রো না। আমাকে বিশ্বাস কর—বল, আমাকে বিশ্বাস করছ?"

রবির মন যদি উত্তেজিত না থাকিত, তাহা হইলে ললিতার চোখের দৃষ্টি হইতে তাহার প্রশ্নের উত্তর মিলিত। কিন্তু সে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া চলিল, "মধুকর লোক ভাল নয়। সব কথা খুলে' বলা এখন সম্ভব নয়, কিন্তু বিশ্বাস করো, সে লোক খারাপ। তুমি বল, আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছ?"

ললিতার চক্ষু আর্দ্র, কণ্ঠস্বর গাঢ়। সে বলি, "তুমি যা বলবে আমার কাছে তাই আদেশ। তুমি নরকে যেতে বল, আমি তাও যাবো।"

ললিতার ডান হাতখানা নিজের দুই মুঠির মধ্যে ধরিয়া রবি তাহা নিজের বুকের উপরে স্থাপনা করিয়া কহিল, "ললিতা, আমি তোমার বিশ্বাসের যোগ্য এ জেনে আমার বল দ্বিগুণ হল। তোমাকে যা করতে হবে বলছি। তুমি মধুকরকে ব'লো যে শৈলেন ঘোষই তোমার সম্পত্তির তদারক করবে। এতে বিপদ ঘটবে—একথা তোমাকে আগে থেকে' বলে রাখছি—কিন্তু যাতে তোমার একগাছি চুলেরও ক্ষতি না হয়, আমি প্রাণপণে সে চেষ্টা করব। এ নাটকের যবনিকা বোধহয় আর তিন দিনের মধ্যেই পড়্‌বে। ভাল কথা, মধুকর তোমাকে কতক্ষণ ভেবে দেখবার সময় দিয়েছে?"

"সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।"

"হুঁ, খুব চট্‌পটে লোক দেখছি।"

রবির নিকটে বিদায় লইয়া ললিতা বাহিরে আসিয়া একখানি ফিটন্ ভাড়া করিয়া আধ ঘণ্টাটাক ময়দানে গঙ্গার ধারে বেড়াইল। সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, এক শত গজ দূরে থাকিয়া একখানি ফিটনে খদ্দরপরা একজন কালো লোক তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। চৌরঙ্গীতে আসিয়া সে যখন বাস ধরিল, লোকটী তখনো তাহার পিছনে পিছনে। কিন্তু বাড়ী ফিরিবার পর লোকটীর আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

ললিতা বাড়ী ফিরিয়া দেখে মিস্ পল্লীওয়াল তখনো বসিয়া আছেন। সে তাঁহার প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করিয়াই বলিল, "মিস্ পল্লীওয়াল, আমি স্থির করেছি, সম্পত্তির ভার অনন্তবাবুর এটর্নী শৈলেন ঘোষের হাতেই রাখব।"

মিস্ পল্লীওয়ালের চোখমুখের ভাব বেশ একটু কঠিন হইল। ললিতা মনে করিল, তিনি বিরক্ত হইয়াছেন। তা হইলেনই বা! যাহা হউক, তিনি মুহূর্তে মুখভাব সংযত করিয়া শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন স্থির কর্‌লে?"

ললিতা জবাব দিল, "আজ বিকালে। মধুকর বাবু যখন উইলের একজন সাক্ষী, তখন তাঁ'র পক্ষে এটর্নী হওয়া আমার ভাল মনে হয় না।" কিন্তু এই কথা বলার সময়ে ললিতার মুখের রক্তিমাভা তীক্ষ্ণদৃষ্টি বৃদ্ধার চোখ এড়াইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মিস্ পল্লীওয়াল বিদ্রূপমিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "তোমার সদ্-বিবেচনা অতুলনীয়। মধুকরের এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি তাকে বলে' দিয়েছি, অনন্তের সম্পত্তির ভার নিতে। কাজেই অন্ততঃ আমার মুখ রাখার জন্যও মধুকরকে তোমার এটর্নী করতে হ'বে।"

মিথ্যা কথা বলা ললিতার অভ্যাস নয়, বরঞ্চ মিথ্যাকে সে ঘৃণাই করিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মিথ্যা না বলিয়া কোন উপায়

ছিল না। সে দেখিল, মিস্ পল্লীওয়াল্ মধুকরের হাতে সম্পত্তির ভার দেওয়ানর জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কাজেই সে বলিল, "আমি যে শৈলেন ঘোষকে চিঠি সই করে দিয়েছি। এখন কেমন করে মধুকরবাবুকে চিঠি দিই ?"

মিস পল্লীওয়াল টেবিলের উপর হইতে চশমাটী তুলিয়া লইয়া চোখে দিলেন। তারপর নিজের হাতের আঙুল লক্ষ্য করিতে করিতে বলিলেন, "তাইতো! আচ্ছা, যার চারা নেই সে নাচার।. ড্রাইভারকে বলো যে আমি পাঁচটার সময় বেড়াতে যাবো।"

সাতটার সময়ে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন, "ললিতা, আমি মধুকরকে বলে' এলাম। সে খানিকটা দুঃখিত হ'য়েছে. কিন্তু হলেই বা উপায় কি ? বিশেষ সে তোমাকে বিয়ে করবার জন্য উৎসুক ছিল। যাক্ সে কথা—আমি আজ মধুকরের নেমন্তন্ন নিয়েছি, তার সাথে রাত্রে গ্র্যাণ্ড্ হোটেলে ডিনার খাবো। তারপর এখনই রমাপতি সিংয়ের আসার কথা আছে—সেই রমাপতি, যাকে খড়দায় দেখেছ বলেছিলে। লোকটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে, অথচ যদি আসে, বলবারও উপায় নেই যে তুমি বাছা অন্যত্র গিয়ে আড্ডা দাওগে! কাজেই আমাকে এখনি পালাতে হ'বে। তুমি বাছা, আজকের মত একলাই খাওয়া-দাওয়া ক'রো, আর সেই সৌখীন গর্দ্দভটা এলে' যেমন ক'রে হোক বিদায় ক'রো।"

পোনর মিনিট পরেই তিনি সাজগোজ করিয়া নীচে আসিলেন

এবং ললিতাকে বলিলেন—"চাকরদের কোন কাজকর্ম্ম আজ নেই। তাদের রাত এগারটা পর্য্যন্ত ছুটি দিয়ে দাওগে। শুধু আয়া, বাবুর্চ্চি আর দরোয়ান যেন থাকে।" এই বলিয়া তিনি নিমন্ত্রণ রাখিতে চলিয়া গেলেন।

ললিতা বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এ বাড়ীতে থাকা আর চলে না। কোন একটা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত সে কোন হোটেলেই থাকিবে। এখনকার হাঙ্গাম চুকিয়া গেলে—রবি বলিতেছিল বিপদ আছে, কী সে বিপদ? যে বিপদই হোক, রবি যখন আছে, তাহার ভয় নাই। বিপদের আশঙ্কা এবং রবির সান্নিধ্য—এ দুইটার মধ্যে দ্বিতীয়টাই তাহার কাছে বেশী বলবৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আপাততঃ হোটেলেই থাকিবে তারপর রবি যদি—কথাটা ভাবিতেই সুখের স্বপ্নে সে তন্ময় হইয়া গেল।

এমন সময়ে সদর দরজায় কে কড়া নাড়িল। ললিতা চমকিয়া চাহিয়া দেখে, বাবুর্চ্চি কখন টেবিলে চায়ের কেট্‌লী প্রভৃতি দিয়া গিয়াছে। হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কেট্‌লী গরমই আছে। দরোয়ানকে ডাকিয়া সে বলিল, বাবুকে ঘরে পাঠাইয়া দিতে।

যে লোকটী আসিয়া ঢুকিল, সে রমাপতি সিং নয়, একজন পুলিশ অফিসার। সে আসিয়াই বলিল, "মিস্ সেন?"

ললিতা জানাইল, সে-ই মিস্ সেন।

"আপনাকে একবার লালবাজারে যেতে হবে। একটা বিশেষ

ব্যাপারে আপনার জবানবন্দী দরকার, এখনি যেতে হবে। ইন্‌স্পেক্‌টার দত্ত সেখানে রমাপতি বাবুকে নিয়েই আছেন, কাজেই রমাপতি বাবু এখানে আসতে পারবেন না।"

ললিতার আপত্তির আর কোনো কারণ রহিল না। সে বলিল, "আচ্ছা, আমি প্রস্তুত। কিন্তু একটু চা খেয়ে নিয়ে গেলে হয় না?"

চা ঢালা হইয়াছে, এমন সময়ে অফিসারটী বলিল, "মধুকর বাবু যে কাগজ দুখানা সই করার জন্য দিয়েছিলেন, সে-দুখানাও দরকার।' সে দুখানা কি আপনার কাছে আছে?"

কাগজগুলা পাশেই আপিস ঘরে ছিল, ললিতা এক মিনিটের মধ্যে লইয়া আসিল। তারপর দুজনে চা পান করিল। তারপর উঠিয়া ললিতা বলিল, "দাঁড়ান আমি এখনই তৈরী—"

কথা শেষ করিতে হইল না, তাহার পূর্ব্বেই সে সংজ্ঞা হারাইয়া টলিয়া পড়িল। পুলিশ ইন্‌স্পেক্‌টার তাহাকে দুইহাতে ধরিয়া একটা সোফায় বসাইয়া দিল।

নীচের ঘরগুলি খুঁজিয়া লোকটা দেখিল, আয়া ও বাবুর্চ্চি কেহই উপরে নাই। দরোয়ান বাহিরে বসিয়া ঝিমাইতেছে। সে ললিতাকে কোলে করিয়া লইয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

অন্দরের উঠানটুকু পার হইলেই পাঁচীলের গায়ে একটা দরজা। দরজা খুলিলেই একটা অনতিপরিসর গলি, তাহার অপর পারে একটা গ্যারেজ, তাহার পাশে টালির ছাওয়া কয়েকখানি ঘর। গ্যারেজের দরজা খোলাই ছিল, লোকটা ললিতাকে আড়কোলা

করিয়া লইয়া একখানি ছাত-ঢাকা গাড়ীর পিছনের সিটে বসাইয়া দিয়া জানালায় কাপড়ের পর্দা টানিয়া দিল। তারপর গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া গলি দিয়া বাহির হইয়া সার্কুলার রোডে পড়িল। তারপর বরাবর উত্তরে।

বাগবাজারের পুল পার হইয়া লোকটী একবার ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিল, ললিতা সেনের জ্ঞান হইয়াছে কি না, কিন্তু তাহার মুদ্রিত চক্ষু দেখিয়া বুঝিল এখনও জ্ঞান হয় নাই। গাড়ী অনতিবেগে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড বাহিয়া চলিতে লাগিল।

আধঘণ্টা পরে ললিতার জ্ঞান হইল। গাড়ীখানা তখন বড় রাস্তা ছাড়িয়া গঙ্গার কিনারে নামিয়াছে। লোকটী একটা টর্চ্চ জ্বালাইয়া ললিতাকে বলিল,—"এখানে নামো।"

ললিতার তখন জ্ঞান হইলেও শরীরে একটুকুও বল ফিরিয়া আসে নাই। সে বলিল, "আমায় এ কোথায় নিয়ে এলেন? রবিবাবু কোথায়?"

লোকটা কঠোর স্বরে কহিল, "রবি বাবু চুলোয়। বোধহয় এতক্ষণ মর্গে (যেখানে অস্বাভাবিকভাবে মৃতব্যক্তির দেহ লইয়া যাওয়া হয়)। আর তুমি কোথায়, তা দিয়ে তোমার দরকার কি? এখানে নেবে পড়।"

ললিতা বুঝিল, সে শত্রুহস্তে বন্দিনী। সে বহুকষ্টে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। সামনে চাহিতেই দেখিল, অদূরে গঙ্গা। গঙ্গার ওপারে একটা জুট মিলের আলো দেখা যাইতেছে। গাড়ী একটা বাগানওয়ালা বাড়ীর সামনে আসিয়া থামিয়াছিল।

লোকটা টর্চ্চের আলো দেখাইয়া তাহারই একটা ঘরে ললিতাকে লইয়া গিয়া বসাইল। তারপর একটা হারিকেন বাতি জ্বালাইয়া ললিতাকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। দু'জনে একটা সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিলে লোকটা তাহাকে বলিল, "এই ঘরে বা বারান্দায় চুপ করে' বসে' থাকো। আমি সিঁড়ির দরজায় বসে পাহারায় রইলাম। আশেপাশে চারিদিকে এক মাইলের মধ্যে বসতি নেই। যদি টুঁ শব্দটী করো, তাহ'লে খুন করব।"

দোতলার বারান্দাটা একেবারে গঙ্গার উপরেই। ললিতা বারান্দায় আসিয়া দেখিল, গঙ্গার অপর পারে বহুদূর পর্য্যন্ত অনেকগুলি পাটকলের আলো দেখা যাইতেছে। মোটামুটি হিসাব করিয়া সে আন্দাজ করিল, সে কাঁকিনাড়ার অপরপারে আছে। তাহা হইলে তাহার বর্ত্তমান কারাগারের অবস্থিতি পেণেটীতে। সে বুঝিল, পেণেটীর কোন পরিত্যক্ত বাগানবাড়ীতে সে বন্দিনী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ল্যান্সডাউন্ রোডে মিস্ পল্লীওয়ালের বাড়ীর বিপরীত দিকের ফুটপাথে দাঁড়াইয়া যে লোকটী বাড়ীর উপরে নজর রাখিয়াছিল, সন্ধ্যার একটু পরেই সে দেখিল, একজন পুলিশ অফিসার সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু সাড়ে আটটার সময়েও পুলিশের

লোকটীকে বাহির হইতে না দেখিয়া তাহার মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল। সে সরাসর লালবাজার থানায় টেলিফোন করিয়া রবি দত্তকে সংবাদ দিল।

সংবাদ শুনিয়া রবি দত্ত জিজ্ঞাসা করিল বাড়ীতে কে কে আছে। লোকটী উত্তর দিল, "সন্ধ্যার একটু পরেই মিস্ পল্লীওয়াল বাহির হইয়া গিয়াছেন। বাড়ীর বৈঠকখানা ঘর ব্যতীত কোন ঘরেই আলো নাই।"

রবি চিন্তার মধ্যে পড়িল। পুলিশ অফিসার ললিতার নিকটে কেন আসিবে? পুলিশের ললিতাকে প্রয়োজন হইলে রবি সকলের আগেই তাহা জানিতে পারিত। ললিতার কোন ভীষণ অমঙ্গল ঘটিয়াছে আশঙ্কা করিয়া সে সব্‌ইন্‌স্পেকটার অমৃত মুখুজ্যেকে লইয়া বাহির হইল।

কলিকাতাবাসী পাঠকমাত্রেই জানেন, লালবাজারের ফাঁড়ি হইতে পদব্রজে বাহির হইবার দুইটী পথ আছে, একটী চিৎপুর রোডের দিকে আর একটী রাধাবাজার ষ্ট্রীটের দিকে। রবি ও অমৃত রাধাবাজার ষ্ট্রীটের গেট্ পার হইয়াছে, এমন সময়ে রবি দেখিল, ডাল্‌হাউসী স্কোয়ারের দিক হইতে তীব্র আলো ফেলিয়া একখানি গাড়ী ভীমবেগে তাহাদের দিকে আসিতেছে। রবিরা তখন ফুট্‌পাথের মাঝামাঝি। কেমন একটা সন্দেহ হইতেই রবি দাঁড়াইয়া পড়িল এবং অমৃতর হাত টানিয়া-ধরিয়া তাহাকে থামাইল। গাড়ীখানি রাধাবাজারের মোড় পর্য্যন্ত আসিতেই রবি অমৃতকে টানিয়া লইয়া আবার গেটের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানি পূর্ণবেগে ফুটপাথের উপর উঠিয়া পড়িয়া ফাঁড়ির দেওয়ালে আহত হইল। সেই বিপুল সংঘর্ষে চুরমার হইয়া তাহা লোহার পিণ্ডে পরিণত হইল। রবিরা তখন সবেমাত্র গেটের মধ্যে ঢুকিতে পারিয়াছে—আর একটুখানি দেরী হইলেই হইয়াছিল আর কি!

গাড়ীর ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করার জন্য ফটকের পাহারা-ওয়ালাকে হুকুম দিয়াই রবি অমৃতকে লইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে চিৎপুরের গেটের দিকে চলিল। গেট পার হইয়া রাস্তা অতিক্রম করিয়া তাহারা যেই বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের মোড় ঘুরিয়াছে, অমনি তাহারা দেখিতে পাইল, দুইশত গজ দূরে দাঁড় করানো একখানি গাড়ী ষ্টার্ট লইল। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এ-গাড়ীরও হেড্‌লাইট দুইটী জ্বালানো।

একটা দোকানের দরোজার ঠিক সাম্‌নে দাঁড়াইয়া রবি ও অমৃত সিগারেট ধরাইবার ভাণ দেখাইতে লাগিল। এ গাড়ীখানিও বেগ বাড়াইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফুটপাথের উপরে উঠিয়া আসিল। গোয়েন্দাদ্বয় একলম্ফে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গাড়ীখানি পূর্ণবেগে দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া চুরমার হইয়া গেল।

ধাক্কা খাইবার পূর্ব্বেই একটা লোক গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। সে গুরুতরভাবে আহত না হইলেও তাহার চোট্ খুব বেশী লাগিয়াছিল, সে এখন উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই রবি তাহাকে চাপিয়া ধরিল। পুলিশ আসিয়া তাহাকে লালবাজারে লইয়া গেল।

অমৃত বলিল, "এ তো বড় অদ্ভুত দৈব ঘটনা! পর পর দুইখানা—"

রবি বাধা দিয়া বলিল, "ন্যাকামি রাখো, অমৃত। এদের উদ্দেশ্য ছিল, আমাকে খুন করা। মৃত্যু-বিলাসীর দল আমাকে শেষ করার জন্য দুদিক দিয়ে দুখানা গাড়ী রেখেছিল, যেদিক দিয়েই বেরুই, দু'দিকের একদিকেই একটু অন্যমনস্ক কি অসাবধান হলেই কাজ হতে হ'ত। অথচ লোকে মনে করত যে দৈবদুর্ঘটনা ঘ'টেছে। বোধহয় মার্টিন কোম্পানীর সামনে ও বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে ওদের লোক দাঁড় করানো ছিল, আমি বেরুচ্ছি দেখেই তা'রা গাড়ীকে ইসারা করেছে।"

যে-লোকটী ধরা পড়িয়াছিল, সে একজন পুরাতন মোটর-মামলার দাগী আসামী। অপর গাড়ীর ড্রাইভারটীর মৃত্যু ঘটিয়াছে; গোয়েন্দা বিভাগ হইতে জানা গেল, সে একটা বদ্‌মায়েস চীনাম্যান, তাহার পেশা মোটর-ডাকাতি করা। লোকটাকে পুলিশের হেফাজতে দিয়া রবি অমৃতকে সঙ্গে লইয়া মোটরে ল্যান্সডাউন রোডের দিকে অগ্রসর হইল।

ল্যান্সডাউন রোডে মিস্ পল্লীওয়ালের বাটীতে পৌঁছিয়া রবি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে ললিতা বাড়ীতে নাই, মিস্ পল্লীওয়ালও বাড়ীতে ফেরেন নাই। কিন্তু দরোয়ান বলিল যে, "মিসি বাবা সামনের দরজা দিয়া বাহির হন নাই।" তাহার মুখেই রবি শুনিল, পিছনদিকের দরজা দিয়া একটা গলিতে পড়া যায়। রবি সেই দরোজা দিয়া বাহির হইয়াই দেখে, গলির সামনেই

একটা গ্যারেজ, তাহার দুয়ার খোলা। পাশেই খোলার বাড়ীর রোয়াকে একজন লোক বসিয়াছিল; সে ঐ বাড়ীরই বাসিন্দা গরীব ভদ্রলোক, ছাপাখানার প্রুফ পড়িয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। সে বলিল, এক ঘণ্টা আগেও গ্যারেজ বন্ধ ছিল, এবং গ্যারেজে একখানা ঢাকা পুরাতন ফোর্ড গাড়ী ছিল। গাড়ীর মালিক চশমা পরিহিত একজন বাবু। তিনি কে তাহা অজ্ঞাত, তবে মাঝে মাঝে আসিয়া তিনি গাড়ীখানি বাহির করিয়া লইতেন। সেই উপলক্ষে ভদ্রলোকটী তাঁহাকে দেখিয়াছেন। গাড়ীর নম্বরটাও তাঁহার মনে ছিল—বি, ও, এস্, পি, ৩৪৬০।

রবি এইবার মহা চিন্তায় পড়িল। কলিকাতা হইতে বাহির হইয়ার অনেক পথ আছে, দুর্বৃত্তেরা যে কোন্ পথে গিয়াছে, তাহার কোন ঠিকানা নাই। কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া রবি লালবাজারে ফিরিল। মধুকরের বাসায় টেলিফোন্ করিয়া সে জানিল, মধুকর বাড়ীতে নাই। পুলিশের গুপ্তচরদের রিপোর্টে জানা গেল, মধুকর আটটার সময়ে গ্র্যাণ্ড হোটেলে মিস্ পল্লীওয়ালের সঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। খড়দায় টেলিফোন্ করিয়া জানা গেল, রমাপতিও বাড়ীতে নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে মধুপুরে নন্দন স্যানাটোরিয়ামে টেলিফোন্ করিয়া দেখিল। কিন্তু হরনাথ নাকি কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে।

রবি হতাশ হইয়া উপায় চিন্তা করিতে বসিল। যখন প্রায় মধ্যরাত্রি, এক অপ্রত্যাশিত উপায়ে সংবাদ মিলিল।

পাঠকের বোধহয় মনে আছে, গত তিন বৎসর ধরিয়া ফরাসী

চন্দননগর হইতে কলিকাতায় চোরাই নকল রেশমের আমদানী হইতেছে। আবগারী পুলিশ তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করে নাই। কিন্তু এজন্য পুলিশকে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে, অনেক ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। তাহার মধ্যে জলপুলিশ অন্যতম।

ললিতা যখন পেণেটীর গঙ্গাতীরবর্ত্তী নির্জ্জন বাড়ীতে বন্দিনী হয়, তাহার কিছুক্ষণ পরেই আবগারী পুলিশের একজন কর্ম্মচারী চন্দননগর হইতে নৌকায় করিয়া কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন। পেণেটীর সামনে আসিয়া তাঁহার চোখে পড়িল, একটা পরিত্যক্ত বাগানবাড়ীর দোতলার বারান্দায় আলো দেখা যাইতেছে। একেবারে গঙ্গার উপরে বলিয়া বাড়ীটার উপর পুলিশ নজর রাখিয়াছিল, কাজেই তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। তিনি আর কলিকাতায় না গিয়া নিকটের ঘাটে নামিয়া পড়িলেন। স্থানীয় পুলিশকে সংবাদ দিতে একজন সঙ্গীকে পাঠাইয়া দিয়া নিজেই তিনি সাবধানে বাড়ীটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুয়ারেই গাড়ী-খানি দাঁড় করানো ; তাহার নম্বর টুকিয়া লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ থানায় পৌঁছিয়া কলিকাতায় টেলিফোনে সংবাদ জানাইয়া লোকের সাহায্য চাহিলেন।

গাড়ীর নম্বর দেখিয়াই রবি লাফাইয়া উঠিল। তারপর মালিকদের তালিকা খুঁজিয়া সে ঐ গাড়ীর মালিকরূপে যাহার নাম দেখিল, তাহাতে সে আরও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কোথায় গেল তাহার অবসাদ, কোথায় গেল দুশ্চিন্তা ! পাঁচ মিনিট পূর্ব্বের

রবি আর এ রবির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। বন্দুকসহ পোনরজন গুর্খা পুলিশ, দশজন সার্জ্জেণ্ট ও তিন জন দারোগা লইয়া রবি তৎক্ষণাৎ রওনা হইবার উদ্যোগ করিল। এদিকে পুলিশের মোটর বোটে করিয়া কর্ণফোর্ড সাহেব আবগারী পুলিশ-সহ রওনা হইয়া গেলেন।

রবি বাহির হইবার জন্য দরজায় পা দিয়াছে, এমন সময়ে ঝন্ ঝন্ করিয়া টেলিফোন্ বাজিয়া উঠিল। টেলিফোন ধরিয়া রবি জানিল, তাহার পিতা তখনো বাড়ীতে ফেরেন নাই, তাই বাড়ীর সরকার চিন্তিত হইয়া তাহাকে সংবাদ দিতেছে। রবি তাহাকে বলিল, সে পরদিন সকালে ইহার ব্যবস্থা করিবে।

দলবলসহ রবি বাহির হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অল্পক্ষণ পরেই জুতার শব্দে ললিতা বুঝিতে পারিল, তাহার চৌকিদারটী নীচে নামিয়া গেল। গঙ্গার দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল, হয়ত আজই তাহার জীবনের শেষ—রবির সাথে আর দেখা হইল না। রবি কি তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবে? সে ত অনেক বইয়ে পড়িয়াছে, প্রেম, সমুদ্র-পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে

পারে, কারাগার পার হইতে পারে, এমন কি মৃত্যুর পার হইতেও প্রেমাস্পদকে ফিরাইয়া আনিতে পারে। রবি যদি তাহাকে ভাল-বাসিয়া থাকে, তাহা হইলে উভয়ের মিলন কি হইবে না?

এমনি করিয়া ললিতা আকাশ পাতাল ভাবিতেছে, এমন সময়ে কে পিছন হইতে তাহার নাম ধরিয়া ডাকাতে তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কণ্ঠস্বর কাহার, তাহা বুঝিতে না পারিলেও ললিতার মনে হইল, লোকটী তাহার পরিচিত। সে জিজ্ঞাসা করিল "কে?"

লোকটী অন্ধকারে পিছন হইতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর বেশ একটু ব্যগ্রভাবেই বলিল, "ভয় পাবেন না মিস্ সেন। আমি রমাপতি সিং।"

দূরস্থ হারিকেনের অস্পষ্ট আলোকে ঠাওর করিয়াই ললিতা বুঝিতে পারিল, রমাপতি ঠিক প্রকৃতিস্থ নাই। যেন ভীষণ ব্যস্ত। তাহার ধারণা হইল, রমাপতি যেন কাঁপিতেছে সে জিজ্ঞাসা করিল, "রমাপতি বাবু, আমি কোথায়? আমাকে কেন এখানে নিয়ে এসেছে?"

রমাপতি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা জানিনে। তবে আপনার কোন ভয় নেই।"

ললিতার মনে হইল, যে তাহাকে আশ্বাস দিতেছে, সেই তাহার চেয়ে বেশী ভয় পাইয়াছে। রমাপতি থাকিয়া থাকিয়া চুলের মধ্যে আঙ্গুল বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিল, "তাই তো। আচ্ছা—। হুঁ—।" তারপর বারান্দায় খানিকটা

পায়চারি করিতে করিতে বলিল, “মিস্ সেন, আপনি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছেন। ভয়ঙ্কর বিপদে।” তারপর আবার খানিকটা পায়চারী করিয়া লইয়া বলিল, “এর চেয়ে বিপদে কেউ কখনো পড়ে নি।”

রমাপতির ভাবগতিক দেখিয়া এত দুঃখের মধ্যেও ললিতা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সে বলিল, “আপনি তো বেশ লোক! এই বলছিলেন ভয় নেই, আবার এই বল্‌ছেন ভীষণ বিপদ। ভরসা যে কোথায়, তাও জানিনে, আর বিপদ যে কোথায় তাও বুঝিনে।”

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া রমাপতি বলিল—“মিস্ সেন, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। আপনি সত্যিই বিপদে পড়েছেন। এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় আছে—বিয়ে করা। কা'ল যদি আপনি আমাকে বিয়ে করার জন্য রাজী থাকেন, তাহ'লে আপনার কোন বিপদই ঘট্‌বে না।”

ললিতা মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল, “আপনাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব।”

রমাপতি হতাশভাবে বলিল, “করলে ভাল করতেন মিস্ সেন। নইলে—ওঃ!” বলিয়া রমাপতি অস্থিরভাবে পায়চারী করিতে লাগিল। তারপর উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিল, “আমি তো নগণ্য লোক, আমার কোন হাত নেই। ইস, পালাতে পারলে বাঁচতুম। এ পোড়া দেশ ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচতুম।”

একটু পরেই সে খুব ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "মিস্ সেন আমার কথায় রাজী হোন্। নইলে—"

ললিতা বাধা দিয়া বলিল, রমাপতি বাবু, আমি তা পারি না। আপনি ভদ্রলোক, হয়তো আমাকে স্নেহ করেন। আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভালবাসতে পারব না। আপনাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন, আমি সারাজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌ব।"

রমাপতি একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখি। আপনি এখানে একটু বসুন।" বলিয়া সে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল।

খানিকক্ষণ—প্রায় পোনর মিনিট পরে, ললিতার মনে হইল, বারান্দার নীচে উঠানে দাঁড়াইয়া কাহারা যেন চাপা গলায় উত্তেজিত-স্বরে তর্ক করিতেছে। তর্কের বিষয় কিছু বুঝিতে না পারিলেও সে এটুকু বুঝিতে পারিল, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর মোটা এবং আর এক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর সরু। একটু পরেই সে রমাপতির উচ্চস্বর শুনিতে পাইল। রমাপতি বলিতেছিল, "না, এ আমি পারবো না—পারবো না।"

ললিতা শুনিতে পাইল, মোটা গলায় রমাপতিকে কে তিরস্কার করিল। তারপর সব নিস্তব্ধ। অন্ধকারে গঙ্গার বক্ষে পান্সী নৌকার দাঁড়টানার ছপাছপ শব্দ সে শুনিতে পাইল। কয়েকটী ছোট ছোট আলো জ্বালাইয়া একখানি ষ্টীমার—বোধহয় মালবাহী ষ্টীমার—গম্ভীর ঝুপঝাপ আওয়াজ করিতে করিতে চলিয়া গেল শরতের বাতাস এই পরিত্যক্ত নির্জ্জন বাড়ীটার চারদিকের গাছের

মধ্য দিয়া একটা করুণ সর্‌সর্‌ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল। চারিদিকে নক্ষত্রের স্তিমিত আলো—আর বারান্দার পোড়ো বাড়ীর অন্ধকারকে আরো ভীতিজনক করিয়া তুলিতে টিম্‌টিম্‌ করিয়া জ্বলিতেছে—ধোঁয়ামলিন একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন। ওই আলোকের অন্তরালে যেন কত কি ভয়ানক রহস্য লুকাইয়া আছে—যেখানে আলোর গতি গিয়া শেষ হইয়াছে, তাহার পরই যেন শত শত অজ্ঞাত আততায়ী ছুরি উদ্যত করিয়া অপেক্ষা করিতেছে।

আধঘণ্টা এইভাবে যাইবার পর সিঁড়িতে আবার পদশব্দ শোনা গেল। রমাপতি উপরে আসিয়া বলিল, "তারা তোমায় মনস্থির করবার জন্য দু'ঘণ্টা সময় দিয়েছে। তারপর তারা আসবে।"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কারা তারা?"

রমাপতি বলিল, "তুমি চিন্‌বে না। তাদের চল্‌তি নাম "মৃত্যু-বিলাসী।"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি তাদের মুঠোর মধ্যে?"

রমাপতি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিল, "হাঁ, তাই। তাদের একেবারে মুঠোর মধ্যে।"

রমাপতির মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। ললিতা অন্ধকারেও ঠাহর করিতে পারিল, কিসের উত্তেজনায়, সে যেন কাঁপিতেছে। সে জিজ্ঞাস করিল, "মিস্‌ সেন, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যও আমাকে বিয়ে করা কি অসম্ভব?"

ললিতা বলিল, "একেবারেই অসম্ভব।"

রমাপতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা হ'লে আসুন আমার সঙ্গে। কি হ'বে জানিনা, তবে চেষ্টার ত্রুটি করব না।"

দোতলার বারান্দার পাশের সিঁড়ি দিয়া না নামিয়া তাহারা একটা বড় হলঘরের পাশ দিয়া স্নান-ঘরের পিছনে যে একটা ছোট সিঁড়ি ছিল, সেইটা দিয়া নামিল। তারপর বাগানের মধ্যকার একটা অযত্ন-রক্ষিত রাস্তা দিয়া বাড়ীর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। ঘাটে একখানা পান্সী নৌকা ছিল, রমাপতি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "এটাতে উঠে পড়ুন।"

ললিতা নৌকায় ওঠার পর রমাপতি নৌকায় উঠিল, নৌকা ছাড়িয়া দিল।

"মিস্ সেন্, আপনি সাঁতার জানেন ত?"

ললিতা বলিল, "হাঁ, একরকম ভালই জানি।"

নৌকাখানা বিশগজ যাইতে না যাইতেই অন্ধকারের মধ্যে অনেক পদশব্দ শোনা গেল। কে যেন মোটা গলায় বলিল, "নিশ্চয় এই পথেই গিয়েছে। ওপথে তো আমরাই ছিলাম।"

কয়েকটা লোক ঘাটের সাম্‌নে আসিয়া বলিল, "ঐ যে, ঐ যায়।" একজন লোক একটা হুইসল্ বাজাইল।

রমাপতি ও ললিতা কেহই লক্ষ্য করে নাই, ঘাটের খানিকটা পাশে একটা গাছের ছায়ায় অন্ধকারে একখানা মোটর লঞ্চ আলো নিবাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এক মিনিট্ না যাইতেই লঞ্চ-খানায় আলো জ্বলিয়া উঠিল, চক্ চক্ শব্দ করিতে করিতে

নখানা ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। তীরের লোকগুলি তাহাকে ড়িয়া নৌকার অনুসরণ করিল।

রমাপতি বলিল, "সবই বৃথা হো'ল।" পরমুহূর্ত্তেই যখন স কথা বলিল, তখন তাহার কণ্ঠস্বর বেশ দৃঢ়। মনে হইল, স যেন একটা কঠোর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছে।

তীব্র সার্চ্চলাইট জ্বালাইয়া মোটর লঞ্চখানি দশহাতের মধ্যে মাসিয়া পড়িয়াছে। সে আলোয় ললিতা দেখিল, রমাপতি একটা রিভল্‌ভার বাহির করিয়াছে। রমাপতি বলিল, "মিস্ সেন, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।"

ললিতা দ্বিধা না করিয়া গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তে একটা গুলীর শব্দ হইল; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নদীর বক্ষে আরো চারখানি মোটর লঞ্চের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। ললিতা ভাসিয়া চলিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আবগারী পুলিশের চারিখানি লঞ্চ লইয়া কর্ণফোর্ড সাহেব স্বয়ং রওনা হইয়াছিলেন, পাঠক এ সংবাদ জানেন। লঞ্চ চারখানি দ্রুতবেগে পেণেটীর কাছাকাছি আসিয়া দেখিল, একখানা মালবাহী ষ্টীমার যাইতেছে। তাহারই আওতায় লঞ্চগুলি

আলো নিবাইয়া দিয়া বাগান বাড়ীটার সামনে পর্য্যন্ত আসিয়া গঙ্গার অপরপারে নোঙ্গর করিয়াছিল। ষ্টীমারের গর্জ্জনে মোটর লঞ্চের আওয়াজ ডুবিয়া যাওয়াতে কেহই টের পায় নাই যে পুলিশের লঞ্চ কাছেই লুকাইয়া আছে।

দাগী বাড়ীটার সামনে মোটর লঞ্চের আলো দেখিয়া সাহেবের সন্দেহ হইল, ললিতাকে লইয়া আসামীরা ভাগিতেছে। তিনি লঞ্চগুলিকে অগ্রসর হইতে হুকুম দিলেন। এবং তখনি হর্ণ বাজাইয়া ডাঙ্গার পুলিশকে সঙ্কেত করিলেন, যাহাতে তাহারা বাড়া চড়াও করে।

ললিতা যে-গুলীর শব্দ শুনিয়াছিল, সে রমাপতির রিভলভারের। মৃত্যু-বিলাসীদের লঞ্চের সার্চ্চলাইটে গুলীটা বিদ্ধ হইয়া সেটা অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। বস্তুতঃ, ললিতার প্রাণরক্ষার জন্য রমাপতির উদ্দেশ্যই ছিল তাই। পুলিশ যে, সূত্র ধরিয়া ওখানে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সে কেমন করিয়া জানিবে? জানিলে নিজের প্রাণ বিপন্ন করার কোন প্রয়োজনই তাহার হইত না।

কিন্তু ললিতার সুবিধা হইলেও ইহাতে রমাপতির অসুবিধা হইল। নদীর এপারে শত্রুর লঞ্চ, তাহার মধ্যে সশস্ত্র শত্রুপক্ষ; ওপারে পুলিশের সাজানো চারখানা লঞ্চ, তাহাদের তীব্র আলো এপারের দিকে তাক্ করিয়া ঘুরিতেছে। দুইপক্ষের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় তাহাকে দেখা স্পষ্ট যাইতেছে, মৃত্যুবিলাসীরাও তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছে।

নিজে এত বিপদে পড়িয়াও রমাপতি এই কথা ভাবিয়া সান্ত্বনা

পাইল যে, ললিতা মৃত্যু-বিলাসীদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিয়া ওপারে—যেদিক হইতে পুলিশের লঞ্চ আসিতেছিল—সেদিকে চলিল।

কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। সহসা মৃত্যু-বিলাসীদের লঞ্চের একটা গুলী আসিয়া তাহার পিঠে বিদ্ধ হইল। সে নৌকার মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

এই সকল ঘটনা বর্ণনা করিতে যে সময় লাগে, ঘটিতে সময় লাগিয়াছিল তাহার চেয়ে অনেক কম। বোধহয় ললিতার নৌকায় ঘায় দেওয়ার পর তিন মিনিটের মধ্যে এতগুলি ঘটনা ঘটিয়া গেল।

মৃত্যু-বিলাসীদের লঞ্চখানা এখন সোজা তীরের দিকে না গিয়া একটু দক্ষিণদিকে তীর লক্ষ্য করিয়া চলিল। পুলিশের লঞ্চ তখনো নদীর মাঝখানে আসিয়া পৌঁছায় নাই। পোড়ো বাড়ীটার তিনখানা বাড়ী পরে একটা রাস্তা আসিয়া গঙ্গার ধারে শেষ হইয়াছে, লঞ্চখানা সেই ঘাটে আসিয়া থামিল। লঞ্চ হইতে এক বৃদ্ধ এবং পূর্ব্বোক্ত পুলিশবেশধারী লোকটা লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল। তারপর খানিকটা দৌড়াইয়া রাস্তার একটা নির্জ্জন কোণে একখানি গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাতে চড়িয়া বসিল। গাড়ীতে পাগড়ী পরিহিত একজন লোক ড্রাইভারের জায়গায় বসিয়াছিল, তাহাকে বৃদ্ধ চালাইবার হুকুম দিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পেণেটীর অলিগলি পার হইয়া গাড়ীখানি আগড়পাড়ায়

আসিয়া পড়িল। তারপর বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড্ বাহিয়া চলিল। নিজেদের ব্যস্ততার জন্য আরোহীরা লক্ষ্যই করিল না যে তাহাদের পিছনে পিছনে আর এক খানি গাড়ী মধ্যরাত্রির নির্জ্জন পথে আলো নিবাইয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছে।

সোদপুরে পৌঁছিয়া গাড়িখানি বড় রাস্তা ছাড়িয়া আবার গঙ্গার পথ ধরিল। তারপর একটা বাগান বাড়ীর সামনে আসিয়া গাড়ীখানি ভিতরে ঢুকিয়া গেল। যে গাড়ীখানি উহার অনুসরণ করিতেছিল, সেখানাও বাগানবাড়ীর ফটকে আসিয়া থামিয়া পড়িল।

এ গাড়ী হইতে অবতরণ করিল একজন লোক মাত্র। লোকটা বৃদ্ধ, কিন্তু অথর্ব্ব নয়। বেশ সবল বলিয়াই মনে হয়। ড্রাইভারকে থানায় সংবাদ দিতে বলিয়া লোকটা সতর্কভাবে বাগানবাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আধঘণ্টার মধ্যেই ড্রাইভার সোদপুরের থানা হইতে গাড়ী ভর্ত্তি পুলিশ লইয়া ফিরিল। তাহারা নিঃশব্দে বাগান-বাড়ীর চারিদিকে পাহারা দিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে পুলিশ কর্ত্তারা আসিলে পর আসামী গ্রেপ্তার করা হইবে।

—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কর্ণফোর্ড সাহেব যখন লঞ্চ ঘেরাও করিলেন, তখন পাখী পলাইয়াছে। নৌকায় একজন মোটর মিস্ত্রী ব্যতীত অপর কেহ নাই। অগত্যা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তিনি বাড়ীটার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি জানিলেন, ললিতা শত্রুহস্তে।

রমাপতির দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কর্ণফোর্ড সাহেব তীরে উঠিয়া দেখেন, বাড়ীটা পুলিশে গিস্ গিস্ করিতেছে, কিন্তু যাহাদের সন্ধান করিতে এত আয়োজন, তাহাদের কাহারও চিহ্ন নাই। রবি উন্মত্তের মত হইয়া গেল।

সমস্ত বন, জঙ্গল, পরীক্ষা করিয়া না মিলিল ললিতার, না মৃত্যু-বিলাসীদের সন্ধান। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তাঁহারা ফিরিয়া চলিলেন।

পুলিশ, রবি ও মিঃ কর্ণফোর্ড সহ বোঝাই লরী থানার সাম্‌নে আসিয়া থামিয়াছে, এমন সময়ে থানার জমাদার আসিয়া বলিল, কলিকাতা হইতে জরুরী টেলিফোন আসিয়াছে। কর্ণফোর্ড টেলিফোন ধরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "রবি, সোদপুরে একদল জালিয়াতের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেখানকার পুলিশ আমাদের সাহায্য চায়। চলো, এ কাজটা সারিয়া একেবারে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব।

রবির কাছে তখন পৃথিবীর সবই তিক্ত। "অগত্যা তাই চলুন।"

এদিকে সোদপুরের বাগান বাড়ীতে বৃদ্ধ এবং সেই পুলিশবেশ-পরিহিত লোকটী দ্বিতলের একটা ঘরে আলো জ্বালাইয়া বসিয়া কতকগুলি কাগজ পত্র সুটকেশে সাজাইয়া তুলিতেছিল।

পুলিশ-বেশী লোকটা বলিল, "কিন্তু নীলিমার কি দশা হবে ?"

বৃদ্ধ বলিল "তোমার হোটেলের দরুণ অনেক টাকা আছে, তাতেই তার চলা উচিত। কিন্তু ললিতাকে পাওয়া গেল না, ওকে যদি মধুর সঙ্গে বিয়ে দিতে পারতাম, প্রায় সাত লক্ষ টাকা পাওয়া যেত।

সুটকেশটা বন্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিটী বলিল, "সবই মাটী হোল। তোমরাও যেমন, টাকা দেখলে আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। অনন্ত মরেছে, তা' এ কায়দা করে' তার সম্পত্তি হাত করার চেষ্টা কেন ? এমনি তো বেশ ছিলাম। টাকার অভাবটা কি ছিল ? বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন—"

বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিল, দেখ হরপ্রসাদ, আমার সাথে বাজে তর্ক কোরো না। কি ভাল, কি ভাল নয়, তা তোমার চেয়ে আমি ভাল বুঝি। তোমার বাবার মৃত্যুর ঋণ প্রতিশোধ না নেওয়া পর্য্যন্ত আমার আর অন্য কোন চিন্তা নেই। বাকি আছে এক রবি দত্ত, তাকে শেষ করা এখনো হ'য়ে উঠ্‌লো না। এ-কাজ শেষ না করে' এদেশ ছাড়ছি না।"

পিতার নাম শুনিয়া হরপ্রসাদ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "নিশ্চয়ই! রবি শুধু যে বাবাকেই মেরেছে, তা নয়, আমাদের জীবনও অতিষ্ঠা করে তুলেছে। আজ মরে ছিলাম আর কি!"

সুটকেশটা তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধ ও হরপ্রসাদ সিঁড়িতে পা দিয়াছে এমন সময়ে নীচে বহুলোকের জুতার শব্দ শোনা গেল। হরপ্রসাদ পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধও থমকিয়া দাঁড়াইল। দুই জনেরই মন সামনের দিকে এতটা নিবদ্ধ যে, তাহাদের ঠিক পশ্চাতে যে আমাদের দ্বিতীয় বৃদ্ধ একখানা ভারী লাঠি হাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা তাহারা বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিল না।

টর্চ্চের আলো ফেলিয়া কয়েকজন লোক সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিতে লাগিল। রবির উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কে আছ, ধরা দাও। আমরা পুলিশ, বাধা দিলে গুলি করব।"

এক নম্বর বৃদ্ধ বলিল, "রবিই এসেছে। যদি ধরাই দিতে হয়, এবার ওকে সাবাড় করে' তারপর ধরা দেব।"

সিঁড়িটা অর্দ্ধেক পথ উঠিয়া আবার ঘুরিয়া দোতালায় পৌঁছিয়াছে। অর্দ্ধেক সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া তবে দোতলার মুখোমুখী হওয়া যায়। পুলিশ প্রায় ততদুর উঠিয়ছে, তাহাদের টর্চ্চের আলো দেখা যাইতেছে। আর একটা সিঁড়ি উঠিলেই হরপ্রসাদের উদ্যত পিস্তলের লক্ষ্যের মধ্যে পড়া যায়। যে প্রথম আসিবে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

পিছনের বৃদ্ধ এই সময়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাঠিখানি তুলিয়া

হরপ্রসাদের কাঁধের উপরে সবলে আঘাত করিল। পিস্তল হরনাথের হাত হইতে পড়িয়া সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া পড়িল। পর মুহূর্ত্তেই পুলিশের লোক উপরে আসিয়া দু'জনকে জড়াইয়া ধরিল।

টর্চ্চের আলোয় পিছনের বৃদ্ধকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "বাবা, তুমি এখানে!" রায় বাহাদুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোমাকে বাঁচাতে পেরেছি বাবা, এই পরম সৌভাগ্য!" এই বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহে পুত্রকে বুকে টানিয়া লইলেন।

ধৃত দুইজনকে দোতলার পূর্ব্বোক্ত ঘরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বিনয়কৃষ্ণ ও রবি ঘরে ঢুকিতেই এক নম্বর বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "বাঃ, বাপ বেটায় মিলে গোয়েন্দাগিরি করা হচ্ছে বেশ!"

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শুনিয়া রবি চমকিয়া উঠিল। তারপর হাসিতে তাহার ওষ্ঠ স্ফুরিত হইল। কর্ণফোর্ড সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিল, "স্যার, ইহাদের পরিচয় করাইয়া দিই। এই পুলিশ-বেশী লোকটা নন্দন স্যানাটোরিয়মের মালিক হরনাথ রায় চৌধুরী ওরফে হরপ্রসাদ দত্ত, পরলোকগত ডি, আর, প্রসাদ ওরফে রাম প্রসাদ দত্তের বড় ছেলে। আর এই বৃদ্ধা, প্রসাদের সহধর্ম্মিনী, ইহার চলিত নাম মিস্ পল্লাওয়াল। সম্পর্কে ইনি আমার জেঠীমা। ইনিই মৃত্যু-বিলাসীদের নেত্রী। ~~আর হর-~~ প্রসাদ তাহদের প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তা।"

কর্ণফোর্ড সাহেব আর সবই জানিতেন, কিন্তু রবির সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক আছে শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু

সবচেয়ে আশ্চর্য্য হইলেন রায় বাহাদুর নিজে। তিনি বলিলেন "আজ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে যে কথা সবার কাছ থেকে গোপন রেখে এসেছি, তুমি তা জান্‌লে কেমন করে?"

রবি বলিল, "সিঙ্গাপুরে খবর নিয়ে। এদের কথাবার্ত্তা শুনে।"

কর্ণফোর্ড সাহেব ভাবিয়া পাইতেছিলেন না, রায় বাহাদুর এখানে আসিলেন কেমন করিয়া এবং ইহাদের সংবাদই বা পাইলেন কেমন করিয়া। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায় বাহাদুর, আপনি এ-দলের সন্ধান পাইলেন কি করিয়া?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "সাহেব, প্রসাদ যে জালিয়াত, সে কথা আমি বরাবরই জানিতাম। কিন্তু সে আমার ভাই বলিয়া আমি তাহার গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা করি নাই। তারপর রবি তাহাকে ধরিয়া ফেলে—তাহার ফাঁসির দিনই রবিকে হত্যা করার চেষ্টা হওয়াতে আমার ধারনা হয়, প্রসাদের স্ত্রী পুত্রেরাই মৃত্যু-বিলাসীর দলের সভ্য। সুরমা (মিস্ পল্লীওয়াল্) বরাবরই খুব বুদ্ধিমতী। তারপর কয়েকদিন আগে আমার বাড়ীর সামনেই রবিকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকজন লোক রাত্রে গুলি ছোঁড়ে। পরদিন হইতেই অনন্ত মল্লিক নিরুদ্দেশ। প্রকাশ, সে আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু আমি জানি, সে আত্ম-[illegible]।"

মিস্ পল্লীওয়াল্ ক্রুর হাসি হাসিয়া বলিল, "আত্মহত্যা নয়! আমরা যদি হত্যা করিতাম, তাহা হইলে যাহাতে তাহার মৃতদেহ সহজেই পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতাম।"

রায় বাহাদুর মিস্ পল্লীওয়ালের কথা গ্রাহ্য না করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পরদিন কাগজে পড়িলাম, অনন্ত মল্লিক মধুকর গাঙ্গুলীর কাছে উইল করিয়া গিয়াছেন।" এই উইল মিথ্যা বলিয়া আমার নিশ্চিত জানা আছে।

"আজ সন্ধ্যায় আমি কাশীপুরে স্যার প্রাণ শঙ্কর বর্ম্মনের বাগান বাড়ীতে গিয়াছিলাম। রাত্রি সাড়ে আটটার সময়ে পার্টি হইতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, মধুকর এবং অপর একজন বৃদ্ধ একখানি মোটর করিয়া বারাকপুরের দিকে যাইতেছে। ছদ্মবেশ ধরা থাকিলেও বৃদ্ধকে চিনিতে আমার কষ্ট হইল না। আমার মনে সন্দেহ হইল, নিশ্চয় কোন দুষ্কর্ম্মের জন্য ইহারা এদিকে যাইতেছে। আমি আমার সোফারকে বলিলাম, ইহাদের অনুসরণ করিতে। উহারা পেনেটীর একটী নির্জ্জন পথে গাড়ী থামাইলে আমি অনেকটা দূরে একটা নির্জ্জন জায়গা দেখিয়া গাড়ী থামাইলাম। তারপর একঘণ্টা পরে দেখিলাম, মধুকর পায়ে হাঁটিয়া ফিরিয়া গেল। তাহার আধঘণ্টা পরে দেখিলাম, বৌদি এবং হরনাথ দৌড়িয়া আসিয়া গাড়িতে চড়িল। আমার পূর্ব্বধারণা আরও বদ্ধমূল হইল।

আমার দৃঢ় সন্দেহ হইল, হয়তো ইহারা কাহারো সর্ব্বনাশ করিয়া ফিরিতেছে। আমি ইহাদের পশ্চাদানুসরণ করিলাম। তারপর যাহা করিয়াছি, তাহা আপনারা জানেন। তবে লুকাইয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি এইটুকু জানিয়াছি যে-ইহারা

ললিতার সঙ্গে মধুকর গাঙ্গুলীর বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টীত ছিল, কিন্তু সে চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে।”

কর্ণফোর্ড সাহেব রায় বাহদুরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন “পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য আপনি যাহা করিয়াছেন, যে ভাবে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য। কিন্তু আপনি যে বলিতেছেন, অনন্ত মল্লিকের উইল জাল, তাহার প্রমাণ কি?”

মিস্ পল্লাওয়াল্ ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, “আমার স্বামী জাল করিতেন বলিয়া আমরাও কি জাল করিয়া থাকি? আর উইল প্রকাশ করিয়াছে মধুকর, তাহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? উইলে লাভবান্ তো আমরা কেহ নই।”

কর্ণফোর্ড সাহেব বলিলেন, “ঠাকরণ, ন্যাকামো রাখুন। মধুকর গাঙ্গুলী যে আপনারই মেজ ছেলে মধুপ্রসাদ দত্ত, সে পুলিশের অজানা নাই। রায় বাহাদুর আপনি আপনার বক্তব্য বলুন।”

রায় বাহাদুর বলিলেন, “আমার হাতে একেবারে মোক্ষম প্রমাণ আছে। কিন্তু সে প্রমাণ পাইতে হইলে আপনাদের একবার আমার বেলঘরিয়ার বাগান-বাড়ীতে যাইতে হয়।”

রবি এই কথোপ-কথনে একেবারেই যোগ দেয় নাই। বস্তুতঃ তাহার কানে এ-সব কথার অর্দ্ধেক একেবারেই প্রবেশ করে নাই। সে ভাবিতেছিল, ললিতার কি হইল। সে অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “হরপ্রসাদ তুমি বোধহয় বুঝ্‌তে পেরেছ, তোমারই গুলিতে

তোমার ছোটভাই রমাপ্রসাদ মরেছে। তুমি খুনের আসামী, ফাঁসী তোমার অনিবার্য্য। সত্য করে' বল ললিতা কোথায়?"

পৈশাচিক উচ্চহাস্য করিয়া হরনাথ বলিল, "আমি খুনেই হই, আর যাই হই, তোমার ক্ষতিতে আমার আনন্দ। ললিতাকে তুমি ভালবাস, তাই সে কোথায় কেমন আছে, তা আমি বল্‌ব না।"

কি আশ্চর্য্য, পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াও মিস্ পল্লীওয়ালের কোনরূপ ভাবান্তর দেখা গেল না। বরঞ্চ, একটু তিক্তস্বরেই সে বলিল "রমাপ্রসাদ মরেছে? বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুই উপযুক্ত পুরস্কার। রবি, আমি তোমাকে বলছি, ললিতার কি হয়েছে। ললিতা জলে ডুবে মরেছে, তার চাঁদমুখ তোমার আর দেখা হবে না।"

রবির মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রায় বাহাদুর পুত্রকে সস্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, দুইজনের কেহই কোন কথা বলিলেন না। ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কেবল মিস্ পল্লী-ওয়ালের ক্রুর হাস্য ধ্বনিত হইতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ললিতা ভাসিয়া চলিয়াছে। আশ্বিনের ভরা গঙ্গার খরা-ভাটার টানে ললিতা প্রথম ডুব দিবার পর মাথা তুলিয়া দেখিল, অনেক দূর দক্ষিণে আসিয়া পড়িয়াছে। পুলিশ লঞ্চগুলি তখনো মাঝগঙ্গায় আসিয়া পৌছে নাই। ললিতা বুঝিতে পারে নাই

যে বোট্‌গুলি পুলিশের। তাহার মনে হইল, বোধহয় ও-গুলি মৃত্যু-বিলাসীদেরই বোট্‌, তাহাকে অনুসন্ধান করার জন্য ফিরিতেছে। কাজেই সে সাহায্যের জন্য চীৎকার না করিয়া আবার ডুব দিল। এমনি করিয়া মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে ভাসিয়া গেল। রমাপতির কি দশা হইল, তাহা ললিতা জানিল না।

ললিতা চারিদিকে ঠাওর করিয়া কোন পশ্চাদ্ধাবনকারী নৌকা দেখিতে পাইল না। সাম্‌নেই গঙ্গাতীরে আগরপাড়া জুটমিলের আলো দেখিয়া সে ভাবিল, সাঁতরাইয়া ওখানে উঠিবে। ললিতা পূর্ব্বে কখনো গঙ্গায় সাঁতরায় নাই, সুতরাং সে বুঝিতে পারে নাই যে ও-দিক লক্ষ্য করিয়া সাঁতরাইতে আরম্ভ করিলে সে জুটমিলের দুই মাইল দূরে গিয়া কূল পাইলেও পাইতে পারে।

কার্য্যতঃ হইলও তাহাই। জুতাপায়ে প্যাঁচাইয়া সাড়ী পরিয়া শরতের বেগশালিনী গঙ্গায় সাঁতরানো ললিতার কেন, তারাবাই-এরূপ সাধ্য নয়। খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া ললিতা দেখিল, কূলে যাইবার চেষ্টা করা বৃথা। কোন রকমে ভাসিয়া থাকিতে পারিলে হয়তো অবশেষে কোথাও গিয়া ঠেকিতে পারা যাইবে। ললিতা কূলের দিকে সাঁতরাইবার আর চেষ্টা না করিয়া ভাসিয়া থাকিবার চেষ্টাই করিতে লাগিল।

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে তাহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল। শরীরে শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞানও ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। স্রোতে হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া তাহার মনে হইতে

লাগিল, সে যেন উড়িয়া চলিয়াছে। পাখীর মত অপ্রতিহত গতিতে বাধাহীন সীমাহীন আকাশ দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। সেই আকাশের একটা দিগন্ত ভরিয়া একখানা সোনার মেঘ, তাহার মাঝখানে রবির মুখখানা হাসিতেছে। সে একবার ডাকিল, "রবি!" তাহার মুখে প্রশান্তির হাসি দেখা দিল। আর একবার অস্ফুটস্বরে প্রিয়তমের নাম ধরিয়া ডাকিয়া সে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। গঙ্গার প্রবল জলোচ্ছ্বাসের শব্দ তাহার কাণে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া বনমর্ম্মরের মত মৃদু হইয়া পরে একেবারে মিলাইয়া গেল।

ললিতা ভাসিয়া চলিল।

কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে চাঁদ উঠিল। একদল জেলে কয়েকখানি নৌকা লইয়া বেলঘরিয়ার সাম্নে গঙ্গায় মাছ ধরিতেছিল, ললিতার ভাসমান দেহ তাহাদের একজনের চোখে পড়িল। তাড়াতাড়ি করিয়া তাহারা দেহটাকে নৌকায় তুলিল।

চাঁদের আলোয় নিরিক্ষণ করিয়া তাহারা দেখিল, অপরূপ রূপ-লাবণ্যময়ী যুবতীর দেহ। মুদিতচক্ষু, মুখে প্রশান্ত হাস্যরেখা, কিন্তু জীবনের কোন চিহ্ন নাই। জেলেরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তীরের নিকটতম বাড়ীতে লইয়া গিয়া এই যুবতীকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তীরে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল, সম্মুখের বাড়ীতেই আলো জ্বলিতেছে। তাহারা সেই বাড়ীতেই ললিতার দেহ বহন করিয়া লইয়া চলিল।

বাড়ীটি একটা সুন্দর বাগানবাড়ী। সিঁড়ি পার হইয়া বাগানে পড়িতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর বারান্দা হইতে একজন নেপালী দরোয়ান চেঁচাইয়া বলিল, "কোন্ হ্যায়? ঠাহ্রো, আও মৎ।" দোতলা হইতে একটা টর্চ্চলাইটের আলো আগন্তুকদের উপরে পড়িল। কে একজন প্রশ্ন করিল, "কে তোমরা? কি চাই?"

সামনের জেলেটা হাত জোড় করিয়া জানাইল, গঙ্গায় মাছ ধরিতে গিয়া তাহারা একজন মেয়ে লোকের দেহ ভাসিতে দেখিয়া উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। হুজুরের বাড়ীতে আলো দেখিয়া তাহারা হুজুরের কাছে দেহ লইয়া আসিয়াছে, যদি কোন রকমে হুজুর মেয়ে মানুষটাকে বাঁচাইতে পারেন।"

"হুজুর" বলিলেন—"আনো দেহ।"

ধরাধরি করিয়া ললিতাকে নীচের হলঘরে আনা হইল। তাহার পাশের ঘরটা একটা সুশজ্জিত শয়নকক্ষ। একটা বর্ষিয়সী ঝি ও পশ্চিমা আয়া বাড়ীতেই ছিল, তাহারা আসিয়া ললিতাকে সেই শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া তাহার ভিজা কাপড়-চোপড় বদলাইয়া দিয়া শুক্না কাপড় পরাইয়া দিল। একজন লোক বাইসাইকেল লইয়া নিকটতম ডাক্তারের বাড়ীতে ছুটিল।

গৃহস্বামী একজন প্রবীণ ব্যক্তি। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নিদ্রিত ছিলেন বোধহয়, কারণ তাঁহার কোনরূপ সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নাই। যে ব্যক্তি উপর হইতে টর্চ্চের আলো ফেলিয়াছিল, সে তাঁহার কর্ম্মচারী মাত্র। গৃহস্বামী দোতলায়ই ছিলেন, এবার

তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। উক্ত কর্ম্মচারীর নিকটে সকল কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "বিনোদ তুমি নীচের বারান্দায় গিয়ে পাহারা দাও, আমি একবার মেয়েটীকে দেখ্‌ব।"

বিনোদ কি-ধরণের কর্ম্মচারী তাহা বর্ণনা করা শক্ত, কিন্তু তাহার সাজ পোষাক দেখা গেল অবিকল সৈন্যদের মত। অধিকন্তুর মধ্যে দুই কোমরে খাপে ভরা দুইটী রিভল্‌ভার। সে নীচে নামিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে নীচে অবতরণ করিলেন।

বাগান-বাড়ীটা খুব সযত্নে বিন্যস্ত হইলেও অত্যন্ত সুরক্ষিত। গঙ্গার দিকে বাড়ীর বারান্দায় নেপালী সঙ্গীন-উঁচান বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছে। শুধু তাই নয়, একটা প্রকাণ্ড বিলাতী ব্ল্যাড্‌হাউণ্ড কুকুর উঠানে সর্ব্বদা চলা ফেরা করিতেছে। তাহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ সহরের দিকে আর একজন দরোয়ান এবং আর একটা কুকুর। হলের পিছনে সিঁড়ি, তাহার গোড়ায় আরও একটা ব্লাড্‌হাউণ্ড এবং রিভল্‌ভার হাতে একজন বাঙ্গালী, তাহার সাজ পোষাক সৈন্যের মত। সিঁড়ির উপরে যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে, সেখানে একটা মোটা শাল কাঠের দরজা, তাহার সাম্‌নেই একটা স্বয়ংক্রিয় এলার্ম বেল্‌। দরোজার সাম্‌নে কেহ দাঁড়াইলেই বাড়ীময় একটা তীব্র বেল্‌ বাজিয়া ওঠে। এসমস্ত ছাড়া সদর ফটকে একজন পাহারাদার সর্ব্বদা সজাগ হইয়া পাহারা দিতেছে। দর্শক প্রথমেই বুঝিবে, এ বাড়ীর মালিক, চোরই হউক বা ডাকাতই হউক—কাহারো

ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং পাহারা দিবার কোন ব্যবস্থারই ক্রটী রাখেন নাই।

নীচে নামিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে ললিতা যে ঘরে ছিল সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘর উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত, বৃদ্ধ পালঙ্কের কাছে গিয়া প্রথমে ভাল করিয়া কিছু দেখিতে পাইলেন না। তারপর ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ প্রথমে মনে করিলেন, তাঁহার দেখার ভুল ঘটিয়াছে। তারপর আবার ভাল করিয়া দেখিলেন। এবারে আর অবিশ্বাস রহিল না।

উত্তেজিতভাবে বৃদ্ধ হলঘরে প্রবেশ করিলেন। তারপর বিনোদকে ডাকিয়া কহিলেন, "ডাক্তারের জন্য আবার লোক পাঠাও বিনোদ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাক্তার চাই। এ মেয়েকে বাঁচাবার দায়িত্ব যদি কারো থাকে, সে আমার। এখানে যত ডাক্তার আছে, সবাইকে ডেকে পাঠাও।"

ইতিপূর্ব্বে ডাক্তার ডাকিতে লোক গিয়াছিল, পাঠক তাহা জানেন। সৌভাগ্যক্রমে পাড়ার ডাক্তারটী তখনো ঘুমাইতে যান্ নাই, আর একজন স্থানীয় ডাক্তারের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। দুইজনেই অবিলম্বে আসিয়া পড়িলেন।

ডাক্তারি দুইজনের আড়াই ঘণ্টার চেষ্টার পরে ললিতার জ্ঞান হইল। প্রথম চোখ মেলিয়া সে কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাইল না। তারপর অতি ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসপাশের জিনিষগুলি স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তখন সে দেখিল, শিয়রের কাছে

এক প্রবীন ব্যক্তি পরম আগ্রহভরে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। ললিতার মনে হইল, সে মৃত্যুর পরপারের দেশে গিয়াছে। নহিলে চোখ মেলিয়াই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে কেন?

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "মা, এখন কেমন বোধ করছ?"

ললিতার একে উত্তর দিবার মত শক্তি ছিল না, তার উপর বিস্ময়ের আতিশয্যে তাহার যেটুকু বাক্‌শক্তি ছিল, তাহাও লোপ পাইয়াছিল। তাহার মুখে আশ্চর্য্যের যে চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "মা, আমি বেঁচেই আছি। কাগজে যে সংবাদ বেরিয়েছিল, সেটা মিথ্যে, আমি আত্মগোপন করে এখানে রয়েছি। তোমাকে প্রথম অজ্ঞান অবস্থায় দেখে, আমার যে কি উৎকণ্ঠা হয়েছিল, তা আর কি বল্‌ব! আমার মনে হয়েছিল, তোমার যদি আর জ্ঞান না হয়, তা'হলে তোমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।"

ললিতা তাহা হইলে বাঁচিয়াই আছে! ক্ষানিক্ষণ পরে সে ক্ষীণস্বরে বলিল—"তাহ'লে আপনার উইলটা—"

"সম্পূর্ণ জাল। এই উইলটাই তাদের সর্ব্বনাশ করবে। ধর্ম্মের কল!"

"আপনি আমায় বাঁচালেন মিঃ মল্লিক।"—বলিয়া ললিতা চোখ বুজিল। মানসিক আরাম ও শারীরিক অবসাদ উভয়ের ফলে দুই এক মিনিটের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি যখন প্রায় সাড়ে চারিটা, তখন ললিতা গভীর নিদ্রায় অকাতরে ঘুমাইতেছে। ডাক্তার দুইজন রাত্রির মত ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সকালে কলিকাতা হইতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আসিয়া পাকাপাকি ব্যবস্থা করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে।

বেলঘরিয়ার এই বাগানবাড়ীতে আত্মগোপন করিলেও অনন্তের মনে শান্তি নাই। মৃত্যু-বিলাসীদের ভয় তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল; তাহার উপরে ললিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইল, ললিতা যে বাঁচিয়া উঠিয়াছে, ইহা ললিতার বহু সৌভাগ্য। রাত্রির অস্পষ্ট আলোয় চন্দ্রালোকচর্চ্চিত গঙ্গার দিকে তাকাইয়া তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিতে বসিলেন। জীবনে তিনি কোন পাপ করেন নাই, কাহারো কোন ক্ষতি করেন নাই, এমন কি কাহারো প্রতি কোন অন্যায় অবিচারও করেন নাই। তবু কেন তাঁহার একক জীবনের অপরাহ্ণে দুর্য্যোগের মেঘ সমাবেশ?

অনন্ত ভাবিয়া কূল পাইলেন না। চিরজীবন তিনি ঈশ্বরের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া বহু লোভ ও বহু প্রলোভন জয় করিয়াছেন। আজ চরমমুহূর্ত্তে সে-বিশ্বাস বিচলিত হইতে তিনি দিলেন না। ভগবানই তাঁহাকে একটা বিপদের মধ্যে ফেলিয়াছেন,

ভগবানই তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালাইয়া তিনি একখানি গীতা লইয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিলেন।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে অনন্ত সদর দরজার দিক হইতে একখানা মোটরগাড়ীর হর্ণের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। পর পর চারটা হ্রস্ব আওয়াজ—অনন্ত বুঝিলেন রায় বাহাদুর বিনয়কৃষ্ণ দত্ত আসিয়াছেন। তাঁহার গোপন আবাস-স্থলের কথা একমাত্র রায় বাহাদুরই জানিতেন, এ কয়দিন প্রত্যহ তিনি একবার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই প্রত্যুষে কেন?

অনন্ত নীচে নামিয়া আসিলেন। দেখিলেন, একখানা গাড়ী হইতে রায় বাহাদুর, রবি, একজন পুলিশ কর্ম্মচারী এবং মিঃ কর্ণফোর্ড নামিলেন। অপর একখানা গাড়ী হইতে হাতকড়ি বাঁধা পুলিশ-বেশী হরনাথ ও একজন বৃদ্ধ দুই সার্জ্জেণ্টের মধ্যবর্ত্তী হইয়া নামিল। বারান্দায় অন্ধকার ছিল বলিয়া কেহই অনন্তকে ঠাহর করিতে পারিলেন না। অনন্ত হলঘরে প্রবেশ করিয়া বিনোদকে আলো জ্বালাইতে বলিয়া গায়ে একটা জামা দিবার জন্য উপরে চলিয়া গেলেন।

কর্ণফোর্ড সাহেবের দল ভিতরে প্রবেশ করিলে মিঃ কর্ণফোর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায় বাহাদুর, আপনার প্রমাণ দেখিবার জন্য আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। সেই প্রমাণ পাইলে এখনি মধুকরকে গ্রেপ্তার করিতে পারি।"

রায় বাহাদুর হাসিয়া কহিলেন, "সাহেব, প্রমাণ দিবার জন্যই ত আসিয়াছি। দুই চার মিনিট বসুন। সারারাত্রি

জাগিয়া আসিয়াছেন, একটু কাফি পান করুন।" এই বলিয়া রায় বাহাদুর বিনোদকে ইঙ্গিত করিলেন। বিনোদ প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করিতে গেল।

রায় বাহাদুর হলের বাহির হইয়া সিঁড়িতে পা দিয়াছেন, এমন সময়ে দেখেন অনন্ত মল্লিক সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতেছেন। তাহার হাত ধরিয়া তিনি হলঘরের পর্দ্দা ফাঁক করিয়া প্রবেশ করিলেন।

"মিঃ কর্ণফোর্ড, এই আমার প্রমাণ—মিঃ অনন্ত মল্লিক।"

সকলেই এত বিস্মিত হইলেন যে কাহারো মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। ঘরে যদি একটা সূচও পড়িত, তাহার শব্দ বোধ হয় শোনা যাইত। ঘর নিস্তব্ধ।

মিনিটখানেক পরে মিস্ পল্লীওয়াল দাঁতে দাঁত লাগাইয়া চাপা গর্জ্জন করিয়া কহিল,—"শয়তান!" ক্রোধে তাহার চোখ যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

অনন্ত মল্লিক ছদ্মবেশী বৃদ্ধাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তাঁহার মুখে বিস্ময় রেখা দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "কে তুমি? রায় বাহাদুর, এ কে? এতো চেনা কণ্ঠস্বর!"

বৃদ্ধ বলিল—"চিনতে পারো না? শয়তান্, ষ্টুপিড সেজেছ?"

অনন্ত আশ্চর্য্যের সহিত বলিল—"মিস্ পল্লীওয়াল! এ যে মিস্ পল্লীওয়ালের গলা!

'বিনয় বলিল, "হাঁ মিস্ পল্লীওয়াল্। ওরফে মিসেস্ প্রসাদ্

ওরফে মিসেস্ রামপ্রসাদ দত্ত। আর ইনি, আপনার মধুপুরের হোটেলওয়ালা হরনাথ রায় চৌধুরি, ওরফে মিঃ হরপ্রসাদ দত্ত, উক্ত স্ত্রীলোকের বড় ছেলে। রমাপতি সিং ওরফে এই মহিলার ছোট ছেলে রমা প্রসাদ দত্ত"—বিনয়ের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল—"ললিতা সেনকে খুন করবার অপরাধে আজ গ্রেপ্তার হ'য়েছেন। তারপর দেখছি, মহাত্মারা আপনার উইলও জাল করেছেন।"

অনন্ত বলিলেন,—"রমাপতি এর ছেলে! ইস্ বেচারী, জীবন দিয়ে জন্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।"

মিস্ পল্লীওয়াল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"সাবধান হয়ে' কথা ব'লো অনন্ত মল্লিক!"

রবি ধমক দিয়া বলিল,—"চোপ রও।"

মিস্ পল্লীওয়াল্ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি পাগলের হাসি বা প্রাণখোলা হাসি নয়, অত্যন্ত নিষ্ঠুর হাসি। সে বলিল—"আমাদের তো ধরেছ। আমরা না হয় মরব। কিন্তু তোমার ললিতার কি হ'ল? তোমার ললিতাকে এতক্ষণ গঙ্গার কুমীরে খাচ্ছে।" বৃদ্ধা হি হি করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

"এত গণ্ডগোল কিসের?" হলঘরের এক কোন হইতে শ্রান্ত নারীকণ্ঠে কে যেন প্রশ্ন করিল। কণ্ঠস্বর শুনিয়া রবি ও মিস্ পল্লীওয়াল্ দুজনেই চমকিয়া উঠিল।

রবি একলম্ফে গিয়া ললিতার হাত ধরিয়া বলিল "ললিতা সত্যই তুমি! আঃ!"

ললিতা রবির বুকের উপরে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

মিস্ পল্লিওয়ালের অবস্থা তখন উন্মত্তের মত। কর্ণফোর্ড সাহেব সার্জ্জেণ্টদের আদেশ দিলেন, আসামীদের পুলিশ ভ্যানে করিয়া কলিকাতায় লইয়া হাজতে বদ্ধ করিতে এবং মধুকরকে গ্রেপ্তার করিতে। সার্জ্জেণ্টেরা এবং অপরাপর পুলিশের লোকজন, দুইজনকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল, এখানে রহিলেন শুধু অনন্ত মল্লিক, রায় বাহাদুর, মিঃ কর্ণফোর্ড, রবি ও মূর্চ্ছিতা ললিতা। ললিতাকে উত্তেজক পানীয় খাওয়াইয়া শয়ন ঘরে শোয়াইয়া মিঁয়া ডাক্তারকে সংবাদ পাঠাইয়া সকলে হল্‌ঘরে আসিয়া বসিলেন।

চা পান করিতে করিতে মিঃ কর্ণফোর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ মল্লিক, আপনি এখানে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগকে সংবাদ দেন নাই কেন? আপনি যে-দিন নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, আমরাও সেদিন আপনাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য গিয়াছিলাম, সে কথা বোধহয় শুনিয়াছেন। আমরা আপনাকে বিপদের বাহিরে রাখার জন্যই গ্রেপ্তার করিতে চাহিয়াছিলাম।"

অনন্ত বলিলেন, "আমার পরামর্শদাতা রায় বাহাদুর। বস্তুতঃ বাড়ীখানি তাঁহারই। কিন্তু আপনারা কি উদ্দেশ্যে আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিপদের বাহিরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি কি?"

"অবশ্যই পারেন। আমরা সেই দিনই মৃত্যু-বিলাসীদের নামধাম নিশ্চিতভাবে জানিতে পারি। আমাদের ধারণা হয়,

তাহারা আপনাকে নিশ্চয়ই ৪ঠা তারিখে হত্যা করিবে। তাই আমরা আপনাকে বিপদের বাহিরে রাখিয়া, দলশুদ্ধ গ্রেপ্তার করার পর আপনাকে ছাড়িয়া দিব মনে করিয়াছিলাম।”

রায় বাহাদুর বলিলেন, “যে-দিন আমার বাড়ীর সাম্‌নে রবিকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোঁড়া হয় সেই দিনই আমি জানিতে পারি, মৃত্যু-বিলাসীরা কাহারা। সকালেই আমি মিঃ মল্লিককে সাবধান করিয়া দিই, তারপর দুপুরেই এই প্ল্যান্ ঠিক করিয়া এই বাড়ীতে পাঠিয়ে দিই। এই যে সব পাহারাদার দেখিতেছেন, ইহারা প্রাইভেট্ ডিটেকৃটিভ্, আমার খুব বিশ্বাসী লোক। তারপর দিনই দেখি, ওরা অনন্ত মল্লিকের নাম জাল করিয়া উইল খাড়া করিয়াছে। তখন বুঝিলাম, এদের গ্রেপ্তার করা কঠিন হইবে না। তারপর যাহা ঘটিয়াছে তাহা আপনি জানেন।”

এই সময়ে ললিতাকে দেখিবার জন্য ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিলেন, কাজেই কথাবার্ত্তা আর বেশীদূর অগ্রসর হইল না। একটু পরেই কলিকাতা হইতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আসিয়া পড়িলেন। সকলেই ললিতার অবস্থা লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

ডাক্তারেরা পরীক্ষাদি করিয়া সাব্যস্ত করিলেন, ললিতার বিশেষ কিছু শারীরিক ক্ষতি হয় নাই, কেবল মানসিক শ্রান্তির জন্য স্নায়বিক আঘাত লাগিয়াছে। কিছুদিন সুপথ্য এবং সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম পাইলেই রোগী পুনরায় সুস্থ হইবে। স্থির হইল, ললিতা যতদিন প্রয়োজন এই বাগান-বাড়ীতেই অনন্ত মল্লিকের তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং তাহার শুশ্রূষার

জন্য কলিকাতা হইতে দুইজন মহিলা নার্স আসিবে। রবি ও রায় বাহাদুর প্রত্যহ আসিয়া দেখা করিয়া যাইবে, এইরূপ স্থির হইল।

ডাক্তারেরা চলিয়া যাওয়ার পর কর্ণফোর্ড সাহেব এবং রবি বিদায় লইলেন। তাঁহাদের সাম্‌নে এখনো অনেক কাজ। প্রথমতঃ মধুকরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কিনা দেখা। তারপর নীলিমা রায় চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা। তৃতীয়তঃ, সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সকলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা। সে মামলায় যাহাতে রবিদের পারিবারিক কথা প্রকাশ না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রায় বাহাদুর এ বেলার মত বিদায় লইলেন। তাঁহার ব্যাঙ্কে উপস্থিতি প্রয়োজন। কয়েকদিন ধরিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার দামে চড়িতেছে, অপর ডিরেক্‌টারেরা ব্যাঙ্কের নামে ক্রীত শেয়ার-গুলি বেচিয়া দিয়া এই সময়ে লাভবান হওয়ার পক্ষে মত দিয়াছেন। রায় বাহাদুরের মত তাহার বিপরীত। তাঁহার ধারণা একবৎসরের মধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতি-অংশীদার খুব মোটা ডিভিডেণ্ড পাইবে, সুতরাং কি ব্যাঙ্ক কি সাধারণ ব্যক্তি কাহারও শেয়ার বিক্রয় করিয়া দেওয়া উচিত নহে। আজই ডিরেক্টরদের সভায় এই বিষয়ের বিবেচনা হইবে, সুতরাং রায় বাহাদুরের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন।

অনন্ত রহিয়া গেলেন। তাঁহার মন হইতে ভয়ের গুরুভার নামিয়া গেলেও গত দুই তিন সপ্তাহের মানসিক সংগ্রামে মন শ্রান্ত

হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার পক্ষে বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক। তাহা ছাড়া ও তাঁহার কয়েকদিন ধরিয়া কেবল মনে হইয়াছে, তাঁহার একক জীবন তো প্রায় শেষ হইতে চলিল, অর্থোপার্জ্জনও কম হয় নাই, এখন তাঁহার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লইয়া ঈশ্বরের চিন্তায় দিন কাটানো উচিত। গত কয়েকদিনের নির্জ্জন জীবন যাত্রা তাঁহার নিকটে অত্যন্ত লোভনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন, কাজ হইতে এবার অবসর গ্রহন করিবেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মিঃ কর্ণফোর্ড ও রবি লালবাজারে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, মধুকরকে গ্রেপ্তার করিয়া লালবাজার হাজতে আনিয়া রাখা হইয়াছে। সাহেব তাহাকে হাজির করিতে হুকুম দিলেন।

দুই সার্জ্জেণ্টের মধ্যবর্ত্তী হইয়া মধুকর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চুল উস্কো খুস্কো, চক্ষের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। সে আসিয়াই বলিল—"গুড্ মর্ণিং ঘটক সাহেব! ললিতার সাথে আমার বিয়ের সব ঠিক তো? রেজিষ্ট্রারকে আর বসিয়ে রেখে লাভ কি?

চলুন, আগে [illegible] সেরে আসি তারপর গ্র্যাণ্ড হোটেল গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া যাবে।"

কর্ণফোর্ড ও রবি প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। একটু পরেই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, মধুকর পাগল হইয়া গিয়াছে।

মধুকর দুইজনকেই নীরব দেখিয়া বলিল—"কই, তোমরা আমাকে অভিনন্দন করলে না? আমি কত বড় সৌভাগ্যবান্ লোক তা' জান? ললিতা—আরও পাঁচলাখ! বিয়েটা সেরে ফেল স্যার, আমি তোমাদের রোজ ডিনার খাওয়াবো।"

একথারও কেহ উত্তর দিল না দেখিয়া মধুকরের মুখ গম্ভীর হইল সে জিজ্ঞাসা করিল "কই চুপ করে' রইলে কেন? তবে কি ললিতার সঙ্গে রমাপ্রসাদের বিয়ে দেবে ঠিক করেছ? মা'র তাতে মত নেই। আর জানো, রমাটা বোকা। ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়োনা স্যার, দোহাই তোমার। রবি, তোমাকে আমি লাখ টাকা দেব, আমার সঙ্গে ললিতার বিয়েটা দিয়ে দাও। ওঃ, ললিতা—অপ্সরী!" বলিয়া সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সাহেব ও রবি পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। রবি কোনমতেই দীর্ঘনিশ্বাস সম্বরণ করিতে পারিল না।

তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, মধুকর পাগল হইয়া গিয়াছে। পুলিশের ডাক্তারের নজর বন্দীতে তাহাকে রাখিবার আদেশ দিয়া কর্ণফোর্ড সাহেব তাহাকে বিদায় করিলেন।

এদিকে রমাপতির খুনের খবরটা "মহানন্দ" পত্রিকার দুর্দ্ধর্ষ রিপোর্টার সুবোধ বাঁড়ুয্যের কাণে কেমন করিয়া গিয়া পৌছাইয়া-

ছিল। বেলা বারোটা বাজিতে না বাজিতে "মহানন্দ" পত্রিকার বিশেষ সংস্করণে হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষণ বিবরণ ছাপা হইয়া সহরের রাস্তায় রাস্তায় হাজারে হাজারে বিক্রয় হইতে লাগিল। প্রকাশিত বিবরণের সহিত সত্যের খুব নিকট সম্পর্ক না থাকিলেও সুবোধ বাঁড়ুয্যের লিখিবার কৌশলে তাহা এত চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহা পড়িয়া জনসাধারণ চমকিয়া গেল। ললিতার নাম অবশ্য কাগজে অপ্রকাশিতই রহিল, কিন্তু অনন্ত মল্লিকের পুনরাবির্ভাবের কথা এবং রায় বাহাদুরের সাহসের কথা খুব জোরালো করিয়াই বর্ণিত হইল। কিন্তু আসল ঘটনা—অর্থাৎ রবি দত্তের সঙ্গে আসামীদের সম্পর্ক—সুবোধেরও অজ্ঞাত রহিল।

নীলিমাকে ধরিবার জন্য পুলিশের কোন আয়োজনই করিতে হইল না। সংবাদপত্রে রমাপতির হত্যার সংবাদ পড়িয়া সে নিজেই লালবাজারে কর্ণফোর্ড সাহেবের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই অশ্রুমুখী রমণী যে বৃত্তান্ত বলিল, তাহাতে বুঝা গেল, সে ও রমাপতি মৃত্যুবিলাসীদের এই সব হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করিত না। প্রসাদ জালিয়াতি করিয়া যে প্রভূত অর্থ জমাইয়াছিল, তাহার অংশে তাহাদের বেশ সচ্ছল ভাবেই দিন চলিতে পারিত। কিন্তু মিস্ পল্লীওয়াল, হরপ্রসাদ ও মধুকর তিনজনে এত অর্থ পিশাচ, যে এই দুইজনকে বাধ্য হইয়াই সময়ে অসময়ে তাহাদিগকে মৃত্যু-বিলাসীদের অসৎকর্ম্মের সহায়তা করিতে হইত। রমাপতির বুদ্ধি একটু কম এবং স্বভাবে হিংস্রতার অভাব থাকাতে অপর তিনজন তাঁহাকে একটু করুণার চক্ষে

দেখিত। এই জন্য নীলিমা ও রমাপতির মধ্যে স্নেহবন্ধনটা বেশ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

রমাপতি কেমন করিয়া খুন হইয়াছিল এবং তাহার পর কি ভাবে আসামীরা গ্রেপ্তার হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া নীলিমা কোনই উচ্চ বাক্য করিল না। সকল কথা শুনিয়া সে কেবল জিজ্ঞাসা করিল—"আমার সম্বন্ধে আপনারা কি করিতে চান?"

কর্ণফোর্ড সাহেব ভাবিয়া দেখিলেন, বর্ত্তমান মামলা অর্থাৎ রমাপতি হত্যা, ললিতা অপহরণ এবং উইল জালিয়াতি এই তিন ব্যাপারের সঙ্গে মেয়েটীর কোন সংশ্রব নাই। এ অবস্থায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা অকারণ। দ্বিতীয়তঃ মেয়েটী তাহার মা বা ভাইদের মত খল স্বভাবের নহে। বিশেষতঃ সম্প্রতি এই সব ঘটনায় তাহার এমন একটা আঘাত লাগিয়াছে, যাহা হয়ত আর জীবনে দূর হইবে না। সে যাহাতে শান্তির মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিতে পারে, কর্ণফোর্ড সাহেব তাহারই একটা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতে লগিলেন।

রায় বাহাদুর এই সমস্যা সহজেই পুরাইয়া দিলেন। ললিতার সঙ্গে রবির বিবাহ দিয়াই তিনি অবসর লইবেন এবং কার্শিয়ং এ অথবা আলমোড়ায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ভগবৎচিন্তায় কাটাইয়া দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তিনি নীলিমার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহার মায়ের মত লইয়া সে তাঁহার সঙ্গে চলুক। নীলিমা সহজেই রাজি হইয়া গেল।

রায় বাহাদুরের পারিবারিক সম্পর্ক যাহাতে প্রকাশ না পায়,

সে জন্য পুলিশের চেষ্টায় আসামীদের বিচার গোপনে হইল। বিচারে দুইজনের ফাঁসির হুকুম হইল। যে দিন রায় প্রকাশ হইল রবি সে দিনই পদত্যাগ পত্র দাখিল করিল, বলিল, সে বাপের ব্যাঙ্কে চাকুরি লইতেছে। অমৃত শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল, "আসল কথা, বৌ বলেছে বুঝি?"

কথাটা বিশেষ মিথ্যা নয়, কাজেই রবিকে কথাটা একরকম স্বীকার করিয়া লইতে হইল। অমৃত সুযোগ পাইয়া আরো আদিরসাশ্রিত রহস্য করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মোকদ্দমার রায় বাহির হইবার কয়েকদিন পরে কর্ণফোর্ড সাহেব একদিন রবি ও রায় বাহাদুরকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। এক নিভৃত ঘরে বসিয়া চা খাইতে খাইতে সাহেব বলিলেন—"রায় বাহাদুর, আপনাদের পূর্ব্বতন কাহিনী শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি আপনার নিকটে তাহা শুনিতে চাই।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, তাঁহার বলিতে কোন আপত্তি নাই। এই বলিয়া তিনি বলিতে সুরু করিলেন।

"আমার পিতা হিন্দু কলেজে পড়িবার সময়েই খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আসক্ত হন। এক মিশনরীর বাঙ্গালী পালিতা কন্যার সঙ্গে আলাপ ঘনিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুরাগও গাঢ়তর হইতে লাগিল। তারপর একদিন খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই মিশনরীর মেয়েকে বিবাহ করিয়া বাবা সিঙ্গাপুরে চলিয়া যান। সেখানে তাঁহার ভাগ্য ফিরিয়া যায়, তিনি বহু অর্থের মালিক হইয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসেন। সেখানে ১৮৬৫ সালের ১৭ই এপ্রিল আমার দাদা রামপ্রসাদ দত্তের জন্ম হয়। আমার জন্ম হয় ১৮৭০ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে।

আমার যখন অল্প বয়স তখন মায়ের মৃত্যু হয়। দাদা বরাবরই একটু নিষ্ঠুর রকমের ছিলেন। আমাদের বাড়ীর কাছেই আল্লাদী কৃষ্ণরামায়া চেট্টিয়ার নামে এক মাদ্রাজী মহাজন থাকিতেন, তাঁহার মেয়ে সুরমার সঙ্গে দাদার খুব ভাব ছিল। একদিন চেট্টিয়ার মহাক্রুদ্ধ হইয়া বাবাকে আসিয়া বলিলেন যে সুরমার কুমারী ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে এবং ইহার জন্য দাদাই দায়ী। বাবা দাদাকে ডাকিয়া কঠিন তিরস্কার করিলেন। পরদিন সকালে দেখা গেল, দাদাও নাই, সুরমাও নাই, এমন কি সিন্দুকে মায়ের যে সব গহনা ও হীরাজহরৎ ছিল তাহাও নাই। ক্রমে প্রকাশ পাইল, দাদা বাবার নাম জাল করিয়া প্রচুর টাকা মারিয়াছে। মর্ম্মাহত হইয়া বাবা অল্পদিনের মধ্যেই মারা গেলেন, আমি

সিঙ্গাপুর হইতে পাততাড়ি গুটাইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। খৃষ্টানের ছেলে বলিয়া হিন্দু সমাজে আমার স্থান হইল না। আমি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিলাম।

ক্রমশঃ সংবাদ পাইলাম, দাদা ও সুরমা রেঙ্গুনে গিয়া সিভিল ম্যারেজ এক্ট' অনুসারে বিবাহিত হইয়াছে এবং তারপর উত্তর ব্রহ্মে গিয়া বসবাস করিতেছে। সহসা একদিন আমার ব্যাঙ্কে একখানি জাল চেক্ ধরা পড়িল, তাহার এককোণে একটা পেন্সিলে লেখা ক্ষুদ্র স্বাক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম, সে আমার দাদারই কাজ। টাকাটা নিজের গাঁট হইতে দিয়া আমি 'ইংলিসম্যানে বিজ্ঞাপন দিলাম —"আর, ডি! এবার ছাড়িয়া দিলাম, ভবিষ্যতে সাবধান!" সেই অবধি আমার ব্যাঙ্কে আর জাল হয় নাই, কিন্তু অন্যান্য ব্যাঙ্কের উপর জালিয়াতি চলিতে আরম্ভ হয়।

দাদার একটা বিশেষত্ব ছিল, সেটা হইতেছে তাহার ব্যবস্থা বুদ্ধি। সে থাকিত পেগুতে, জালিয়াতি করিত ভারতবর্ষে। ব্রহ্মের লোক তাহাকে ব্যবসায়ী বলিয়াই জানিত। তাহার টাকা সমস্তই থাকিত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কে, কিছু থাকিত সুরমার ছদ্মনামে, কিছু নিজের অনেকগুলি ছদ্মনামে। এই কাজ উপলক্ষে দাদাকে বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বাড়ীর বাহিরে কাটাইতে হইত। রবি দাদার মোটর বোটে যে কয়টী তারিখ খোদাই করা দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার তাৎপর্য্য এই :—

১৭ই এপ্রিল, ১৮৬৫। রাম প্রসাদের জন্ম।

২রা আগষ্ট, ১৮৭০। বিনয় কৃষ্ণের জন্ম।

৮ই জানুয়ারি, ১৮৯৫। হরপ্রসাদের জন্ম।

১৪ই অক্টোবর, ১৮৯৯। মধুকরের জন্ম।

১৭ই জুন, ১৯০১। রমাপতির জন্ম।

২৯শে নভেম্বর, ১৯০৭। নীলিমার জন্ম।

১২ই মে, ১৯৩৩। রামপ্রসাদের ফাঁসী।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৫। অনন্ত মল্লিকের মৃত্যু।

শেষোক্ত তারিখ দুটী দাদার লেখা হওয়া অসম্ভব। বোধহয় রবি ঐ বোটে যাতায়াত করিত দেখিয়া হরপ্রসাদ বা রমাপতি ভয় দেখাইবার জন্য ঐরূপ লিখিয়া আসিয়াছিল।

দাদার ছেলেমেয়েরা বড় হইয়া উঠিলেই দাদা তাহাদিগকে লইয়া দূরের কোন বোর্ডিং স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিত—হরপ্রসাদ পড়িত রেঙ্গুনে, মধুকর পড়িত কলিকাতায়, রমাপতি পড়িত আগ্রায় এবং নীলিমা পড়িত পুণায়। আরও এটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, সকলেই ছদ্মনামে চলিত। বোধহয় দাদার ইচ্ছা ছিল এই যে সকলে আলাদা পরিচয়ে আলাদা হইয়া থাকিলে ব্যাপকভাবে জালিয়াতির সুবিধা ও বাড়ে এবং ধরা পড়ার সম্ভাবনাও কম থাকে। হরনাথের পড়াশুনা শেষ হইলে দাদা তাহাকে মধুপুরে জমা ইত্যাদি কিনিয়া দিল; সে সেখানে ফ্যাসান দুরস্ত হোটেল খুলিয়া বড় বড় লোকের চেক কুড়াইতে লাগিল। দাদা তাহাদের নাম জাল করিয়া মোটা টাকা উপায় করিয়াছিল। মধুকর এটর্নী হইয়া কলিকাতায় বসিল। রমাপতি বুদ্ধিতে খাটো তাহাকে দিয়া বিশেষ কিছু লাভ হইবে না দেখিয়া দাদা তাহাকে

খড়দায় বাড়ী কিনিয়া দিল। নীলিমার স্বভাবটা একটু কোমল বলিয়া সে রমাপতিকে পছন্দ করিত, কিন্তু তাহাকে থাকিতে হইত হরপ্রসাদের সাথে। সুরমা এবং দাদা আলাদা থাকিত। একত্র হইবার প্রয়োজন হইলে তাহারা মধুপুরে গিয়া মিলিত হইত।

দাদা সেই যে বাড়ী হইতে পালাইয়াছিল, তারপর হইতে তার সঙ্গে বা সুরমার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই। রবি যখন প্রসাদের খোঁজে ব্যস্ত ছিল, তখন আমি তাহাকে বার বার নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু এসব পারিবারিক কথা খুলিয়া বলিতে পারি নাই। মিস্ পল্লীওয়াল্ যে সুরমা ছাড়া অপর কেহ নহে, আমি তাহাও জানিতাম না। সে দিন আমার বাড়ীর সামনে রবিকে খুন করার চেষ্টা হয়, সেদিন নীলিমা মূর্চ্ছিত হওয়ার ভান করিয়া আমার বাড়ীতে আসিয়া পড়ে। তাহার হাতের একটী আংটী দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম, সে দাদার মেয়ে। তখন আমার সন্দেহই রহিল না যে মৃত্যু-বিলাসিরা দাদারই পরিবারবর্গ। সেই জন্য আমি কৌশলে অনন্তকে সরাইয়া দিলাম। ফলে দেখিলাম, তাহারা নিজেদের চক্রান্তে নিজেরাই জড়াইয়া পড়িল। জাল উইলের ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিলাম মিস্ পল্লীওয়াল্ কে। অনন্তের কাছে তাহার চেহারার বিশেষত্বের বর্ণনা শুনিয়া আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। তারপরের ঘটনা আপনারা জানেন।"

সাহেব বলিলেন, "রবি, তুমি প্রসাদের পাত্তা পাইয়াছিলে কি করিয়া?"

রবি বলিল, "সম্পূর্ণ দৈবক্রমে। একদিন একজন পার্শী-বেশীকে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ঘুরিতে দেখিয়া আমার সন্দেহ হয়, ইহার মতলব ভাল নয়। তাহাকে অনুসরণ করিয়া ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্কে গিয়া দেখিলাম, সে বয়রামজী গাং ওয়ালা নাম সই করিয়া চৌদ্দহাজার টাকা জমা দিল, তারপর দেখিলাম, সে চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে গিয়া একটা গ্যারেজ হইতে একখানি মোটর বাহির করিয়া চলিল। মোটরখানা বজ্ বজ্ রোডে ময়ূরভঞ্জের মহারাজার বাড়ী পার হইয়া বেশ কিছুদূর গিয়া একখানা বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। আমি সংবাদ লইয়া জানিলাম, সে বাড়ীতে আরও দু'খানি মটর আছে, তাহাদের নম্বরও টুকিয়া লইলাম। খোঁজ লইয়া দেখিলাম, গাড়ীগুলো ভিন্ন ভিন্ন রেজেষ্ট্রি করা। ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্কের জমা রসিদের সহির মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল, দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল যে এই ব্যক্তি প্রসাদ ছাড়া আর কেহ নয়। তাঁহার হাঁটার মধ্যে একটু খোঁড়ানর ভাব ছিল, সেইটাকে লইয়া অনন্ত বাবুর সাথে আলোচনা করিয়া দেখিলাম অনন্ত বাবুর ব্যাঙ্কেও তাহার লক্ষাধিক টাকা জমা আছে। তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য দু'জনে চুক্তি আঁটিলাম।

ইহার দুইদিন পরেই প্রসাদ অনন্ত বাবুর ব্যাঙ্কে টাকা নিতে আসে। অনন্তবাবু তাহাকে খাস কামরায় লইয়া গিয়া এই গল্প জুড়িয়া দিলেন যে হাজী মুবারক এলাহি বলিয়া তাঁহার এক শাসালো খরিদ্দার আছে, তাহার সহি ঠিক থাকে না। এই বলিয়া তিনি চার পাঁচখানা চেক্ বাহির করিয়া প্রসাদকে দেখাইলেন।

তিনি আরও বলিলেন, সহির গরমিল লইয়া কথা কাটাকাটি হওয়াতে মুবারক এলাহি রাগ করিয়াই সেই দিনই তাহার সাড়ে তিন লক্ষ টাকা তুলিয়া লইয়া নিউ বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছে। প্রসাদ এই ফাঁদে পা দিল।

প্রসাদ যে দিন ধরা পড়ে, সে দিন তাহাকে সাহায্য করার জন্য হরপ্রসাদ রমাপতিকে ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দেয়। রমাপতিই তাহাকে চাপিয়া ধরার ছলে রিভল্‌ভার জোগাইয়া দেয়। রিভল্-ভারটা চোরাই, আমি অনেকদিন পরে খোঁজ পাইয়াছিলাম যে এক জাহাজের খালাসী ওটা মিস্ পল্লীওয়ালের কাছে বিক্রয় করিয়াছিল।

যে দিন প্রসাদের ফাঁসী হয়, সে দিন হরপ্রসাদ ও মধুকর আমার পাছু লইয়াছিল। মধুকর গুণধর গোয়ালাকে তালিম দিয়া গাড়ীতে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমার ফেরার পথে সে আমাকে গুলী করে। অকৃতকার্য্য হওয়ার জন্য হরনাথ তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিয়া মোটর বাইকে পলায়ন করে। মধুকরও বোমা মারিয়া আমার গাড়ী ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যায়। মোটর বাইকের নম্বর সন্ধান করিয়া দেখিলাম, ইহার শেষ মালিক হরনাথ। তখন নন্দন স্যানাটোরিয়ামের টেলিফোনের উপরে নজর রাখিলাম। দেখিলাম হরনাথ কয়েকটী লোকের সঙ্গে এক অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলে।

ইহার মধ্যে প্রসাদের মোটর বোটে লেখা তারিখ কয়টী আমার চোখে পড়ে। আমার প্রথমেই ধারণা হয়; প্রথম তারিখটা র, প,

দ, র, জন্মদিন। আমি সিঙ্গাপুরের পুলিশকে সংবাদ দিলাম, ঐ তারিখ ধরিয়া তাহারা কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারে কিনা। ব্রহ্মের পুলিশের নিকটেও প্রসাদের এবং মিস্ পল্লীওয়ালের ফটো পাঠাইয়া সন্ধান নিতে সংবাদ দিলাম।

ঠাকুরদাদা খৃষ্টান ছিলেন বলিয়া প্রসাদের জন্মের সার্টিফিকেট লইতে হইয়াছিল। কাজেই আমাদের তিন পুরুষের পরিচয় সংগৃহিত হইয়া গেল। ঘটনা ক্রমে সেই দিনই ব্রহ্মের পুলিশ কর্ম্ম চারিটী আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি পেগু হইতে যে সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহই রহিল না যে মৃত্যু-বিলাসীরা আমার জেঠিমারই বংশ।"

সাহেব বলিলেন, "রায় বাহাদুর, আপনি মিঃ মল্লিককে গুম্ না করিলে আমাদের আরো ভুগিতে হইত। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

রায় বাহাদুর একটু হাসিয়া বলিলেন, "সাহেব, আমরা হিন্দু, অদৃষ্ট মানি। আপনারা ভাগ্যের আকস্মিকতায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি ভাগ্য-দেবতার অমোঘ বিচারে। মানুষের চেষ্টার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। আমি নিমিত্ত মাত্র।"

সাহেব রবিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "রবি, তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলে, এজন্য আমি বড় দুঃখিত। আশা করি মাঝে মাঝে আমাদের খোঁজ খবর লইবে।"

রবি বলিল, "স্যার, আপনি একথা ধরিয়া লইতে পারেন যে আমি সর্ব্বদাই আপনাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত। যদি

আমাকে কখনো প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, একটু স্মরণ করিবেন।"

সাহেব সংশয়ের সুরে বলিলেন, "কিন্তু মিসেস্ দত্ত কি রাজী হইবেন?"

"মিসেস্ দত্ত" তখন রায় বাড়ীতে বসিয়া একটা নূতন ফিক্টর ভিক্ট্রোলা গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপাইয়া গান শুনিতেছিলেন—

"তুমি পালিয়ে যাবে গো
আমি দ্বার খুলে' আর রাখব না।"

সমাপ্ত

সংবাদপত্রের অভিমত

"FORWARD"—There is however, some distinct sign of departure from the old, effete stuff in this new series, the first of which "Nagini" has just been published. The story is gripping with a kind of romantic touch and at once suggests originality. We unhesitatingly recommend its use to all public libraries of Bengal.

"ADVANCE"—The story revolves round the attempt of a very beautiful but scheming girl to get possession of a fortune owned by one of her suitors and the determination of a friend to save him and his money from her clutches. It is full of adventures and hair-breadth escapes from terrible accidents. The printing and get up of the first book is excellent and the series will; I have no doubt, be very popular with the public if the subsequent volounmes are as interesting as the first book.

"আনন্দ বাজার পত্রিকা"—রহস্য, কিঞ্চিৎ উত্তেজনা ও শেষ পর্য্যন্ত কৌতুহল বজায় রাখিবার ক্ষমতা "নাগিনী"র আছে। বাজারে এই শ্রেণীর বই আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু এই পুস্তকখানির নূতনত্ব ইহার মার্জ্জিত ভাষা। চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যেই যাঁহারা বই পড়েন, এই বইখানি ক্রয় করিলে তাঁহারা আনন্দ পাইবেন।

"বর্ত্তমান"—বইখানি পড়ে দেখলাম যে শুধু থ্রিলার নয়, এর মধ্যে নূতন আইডিয়া আছে। উকীল অপূর্ব্ববাবু যখন সহসা আত্ম-উন্মোচন করলেন, তখন আমরা বিস্মিত হয়ে ছিলাম মনে পড়েছিল কনান ডয়েলের "দি ভ্যালী অফ্ ফিয়ার" এর কথা।

"নাগিনী" সুনয়নীর চরিত্র এত স্পষ্ট ফুটে উঠেছে যে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের আনুসঙ্গিক রোমাঞ্চ থাকা সত্ত্বেও তাকে দানবী মনে হয় না, মনে হয় বিপথ চালিতা সাধারণ মানবী। এই বই এর ছাপা ও বাঁধাই এত মনোরম, যে তার তুলনায় দাম বেশী নয়। পাঠকেরা এই বই পড়ে যথেষ্ট আমোদ পাবেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি।

"নাচঘর"—বাংলা সাহিত্যে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস নতুন নয়, এ-ধরণের উপন্যাসের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাদের কাছে "নাগিনী" সমাদর লাভ করবে আশা করা যায়। পুস্তকটিতে গণপতি নামক একব্যক্তির হত্যাকে কেন্দ্র ক'রে নানা রোমাঞ্চকর বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে বেলা নাম্নী এক শিক্ষিতা যুবতীর জীবনের পরিণতি দেখান হ'য়েছে। সহজ অনাড়ম্বর ভাষা ও ঘটনাবলীর স্বাভাবিক বর্ণনার কৌশলে নাগিনী সুখপাঠ্য হয়েছে।

"খেয়ালী"—"নাগিনী" বইখানিতে যাহাতে পাঠকের মন আসল ঘটনার সূত্র হইতে বিক্ষিপ্ত না হয় সেই দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভাষা সরল ও সহজ গতিশীল, ঘটনা সমাবেশ অভিনব ও চমকপ্রদ। বইটী পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ না করিয়া উঠা যায় না। স্থানে স্থানে রোমাঞ্চকর বিভীষিকার সমন্বয়ে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী পাঠকের মনে একটি সভয় উদ্বেগ সৃষ্টি করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছে। ছাপা বাঁধাই ভাল।